দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

চোরেরা তফাত যাও :
রাহুমুক্ত হোক
পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা
— পৃঃ ১৩

ঝড় আসছে
ঘুম নেই
সুখের পায়রাদের
— পৃঃ ২৪

৭১ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ৮ এপ্রিল ২০১৯।। ২৪ চৈত্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

এবারেও কি মোদী ঝড়?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২৪ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৮ এপ্রিল - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রাহুলের মুখরক্ষায় ভরসা কেরলই ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদির চোখে দেশ জয়, বিজেপি আর সহজ নয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

বামপন্থীরা নিজেদের বানানো সত্যেই শুধু আস্থাবান ▯ মনমোহন বৈদ্য ▯ ৮

উনিশের নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার বিদেশি ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

চোরেরা তফাত যাও, রাহুমুক্ত হোক পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা ▯ সনাতন রায় ▯ ১৩

আজকের ভারত ঐক্যবদ্ধ, নতুন ভারত ▯ নীতীন রায় ▯ ১৬

বিরোধীরা চোখ মেলেও শুধু অন্ধকার দেখছে ▯ তরুণ বিজয় ▯ ১৮

দেশজুড়ে বিজেপি ঝড়, আগ্রহ বাড়ছে সব মহলে ▯ ২৩

ঝড় আসছে, ঘুম নেই সুখের পায়রাদের ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৪

বিরোধীদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাই গতি দিয়েছে মোদী ঝড়ের ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৬

এবার পরিবর্তনের পালা ▯ সৃজিত রায় ▯ ২৮

বসন্তেই মহামায়ার প্রথম আরাধনা ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

রাজাবাজার সেন পরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্নপূর্ণা পুজো ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাতে নতুন ভারত গড়তে হবে ▯ কৃষ্ণা দাস (মাইতি) ▯ ৩৬

'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙ্গে'র সমর্থকরা দেশোদ্ধারের জোট করছে ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ৩৭

অশোক গেহলটদের আর এস এস কটাক্ষ শোভন নয় ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৪৩

উচ্চবর্ণের সংরক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বাস্তব ক্ষেত্র ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী ▯ ৪৪

দেশের যুবা প্রজন্ম দেশকে আরও শক্তিশালী দেখতে চাইছে ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ অন্যরকম : ৩৫ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০▯ রঙ্গম : ৪১ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪২ ▯ স্মরণে : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৫ এপ্রিল
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
১৫ এপ্রিল
২০১৯

বাংলা নববর্ষ বিশেষ সংখা - ১৪২৬

আর মাত্র কয়েকদিন। তারপর আর একটি চৈত্রমাস আমাদের জীবন থেকে খসে পড়বে। আমরা পৌঁছে যাব বাংলা নববর্ষের দ্বারপ্রান্তে। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা কী দেখছি? আমাদের সোনার বাঙ্গলা এবং ভুবনজয়ী বাঙ্গালিয়ানা কি এখন আর আগের মতো সোনালি আভা ছড়ায়? ক্ষমতা এবং দলতন্ত্রপ্রসূত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের জাঁতাকলে পড়ে আজ বাঙ্গলার সংস্কৃতি অবক্ষয়ের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। স্বস্তিকার আগামী নববর্ষ সংখ্যার বিষয় বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। লিখবেন— অচিন্ত্য বিশ্বাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সনাতন রায় প্রমুখ।

এছাড়াও আগামী লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে দুটি বিশেষ রচনা। বিষয় : ঊনিশের নির্বাচন এবং বাঙ্গলা মিডিয়া। লিখবেন সৃজিত রায় এবং অভিমন্যু গুহ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

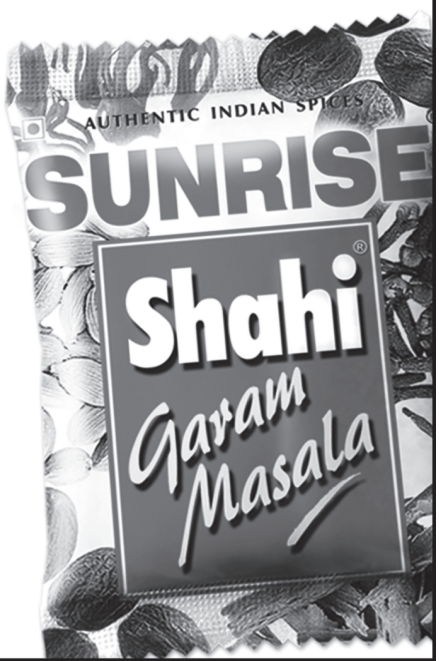

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জোশ ইজ হাই

ঝড় উঠিয়াছে। নির্বাচনী ঝড়। স্বাভাবিক ভাবেই দেশবাসীর মনেও ঝড় উঠিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বেও এমন ঝড় উঠিয়াছিল কিন্তু এই বারের ঝড় পূর্বাপেক্ষাও প্রবল ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশবাসী বহু বৎসর পর এমন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পাইয়াছে। দেশবাসী অনুভব করিয়াছে পূর্বের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ভাবে তাহাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কখনও ভাবিতে পারে নাই। দেশের সেনাবাহিনীর হাতে সময়োপযোগী যুদ্ধোপকরণ তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতে পারে নাই। বহিঃশক্তির মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দ্বারা দেশবাসীর রক্তে দেশেরই মাটি লাল হইলে অথবা সেনাবাহিনীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা হইলে কোনও সিদ্ধান্ত লইতেই পারে নাই। সেক্ষেত্রে তাহারা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া থাকিয়াছে এবং ক্রমাগত দেশকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়াছে। বিশ্বের দরবারেও তাহারা ভারতের মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারে নাই। শুধুমাত্র তাহারা নিজেদের পরিবার অথবা দলের কথা ভাবিয়াছে।

বহু বৎসর পর দেশবাসী এমন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পাইয়াছে যাহারা অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করিয়াছে, দেশবাসীর জীবনযাপনের মানোন্নয়ন করিয়াছে, মাতৃশক্তিকে সশক্ত করিয়াছে, এমনকী তিন তালাকের মতো কুপ্রথা রদ করিবার বিল আনিয়া মুসলমান নারীদের সম্মানের জীবন প্রদান করিবার প্রয়াস করিয়াছে, সেনাবাহিনীকে সময়োপযোগী যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত করিয়াছে, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। শত্রু দেশের হাতে বন্দি সেনা অফিসারকে অল্প সময়ের মধ্যে সসম্মানে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। সর্বোপরি বিশ্বসভায় দেশকে যোগ্য আসনে বসাইতে পারিয়াছে। বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করিতে পারিয়াছে। ভারত বিশ্বে এক শক্তিধর রাষ্ট্রের পরিচিতি লাভ করিতে পারিয়াছে। এই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে অন্তরীক্ষেও ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

এই বার জনমানসে পূর্বাপেক্ষা ঝড় আরও প্রবল হইয়াছে, কারণ পূর্বের কংগ্রেস নেতৃত্ব ৫৫ বৎসর দেশ শাসন করিয়া দেশবাসীকে কেবল ভাঁওতাই দিয়াছে। তাহারা শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকিবার জন্য গরিবি হটাওয়ের স্লোগানই দিয়াছে। তাহাতে গরিব আরও গরিব হইয়াছে। এই বার প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া আবার ভাঁওতা দিতে শুরু করিয়াছে। নির্বাচনে জয়ী হইলে তাহারা নাকি দেশের ২০ শতাংশ সব চাইতে গরিব পরিবারকে বৎসরে ৭২ হাজার টাকা করিয়া দিবে। দেশের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন দেশের ২৫ কোটি গরিব মানুষের জন্য বৎসরে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? তাঁহাদের অভিমত, ইহাতে দেশ দেউলিয়া হইয়া যাইবে। ঝড়ে দিশাহারা হইয়া কেহ আবার বলিতেছেন, নির্বাচনে জিতিলে তাহারা নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে মৃত জঙ্গি পরিবারগুলিকে কয়েক লক্ষ করিয়া টাকা এবং যে সকল জঙ্গি জেলে রহিয়াছে তাহাদের মুক্ত করিয়া দিবে। প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহারা বিজেপির বর্তমান বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে অকথা-কুকথায় ভরিয়া দিতেছে।

বস্তুত এই বারের ঝড় যাহা কিছু অমঙ্গল, অশুভ, ভাঁওতা, দেশদ্রোহী, দেশবিরোধী, নীতিহীন, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ সবকিছু উড়াইয়া লইয়া যাইবে। দেশবাসী এইবার দেশের জন্য মতদান করিবেন, দলের জন্য নহে। কেননা, দেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া দেশের হাল ধরিয়া রহিয়াছেন। তাই এখন দেশবাসীর 'জোশ ইজ হাই'।

সুভাষিতম্

সানুকূলে ভবেত্তস্মিন্ দোষোঽপি গুণসংহতি।

গুণোঽপি দোষতাং যাতি বক্রীভূত বিধাতরি।। (চাণক্যনীতি)

মূলত বিধাতা অনুকূল হলে দোষসমূহ গুণে পর্যবসিত হয়। কিন্তু বিধাতা প্রতিকূল হলে গুণও দোষে পরিণত হয়।

রাহুলের মুখরক্ষায় ভরসা কেরলই

বিশ্বামিত্রের কলম

কেরলের ওয়েনাড কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্তটা অবশেষে নিয়েই ফেললেন কংগ্রেস সুপ্রিমো রাহুল গান্ধী। এত জায়গা থাকতে কেরল কেন? যেখানে রায়বেরিলি, আমেঠির মতো গান্ধী পরিবারের গড় রয়েছে, উপরন্তু মায়া-অখিলেশ যখন এসব ক্ষেত্রে প্রার্থী না-ও দিতে পারেন, স্রেফ আমেঠিতে লড়বার ঝুঁকি রাহুল তখনও নিতে পারলেন না কেন? গত লোকসভা নির্বাচনেই স্মৃতি ইরানি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন আমেঠিতে রাহুল মোটেই নিরাপদ নয়। এসব কথা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা অন্য জায়গায়— এত কেন্দ্র থাকতে কেরল কেন? আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসের মুখপাত্র জানিয়েছেন ওয়েনাড কেন্দ্রটি কেরলে, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের সংযোগস্থলে। তাই নাকি দক্ষিণ ভারতে ভালো ফলের আশায় রাহুল সেখানে দাঁড়িয়েছেন।

এসব ছেলেভুলানো কথায় পারতপক্ষে কেউ বিশ্বাস করবে না। গত লোকসভা নির্বাচনেই তামিলনাড়ু থেকে কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। কর্ণাটকে কীভাবে কংগ্রেস-সেকুলার জনতা দলের সরকার চলছে সকলেরই জানা। মোদ্দা কথা, তামিলনাড়ু-কর্ণাটক থেকে কংগ্রেসের ঝুলি যে এবার প্রায় শূন্য থাকছে তা নিশ্চিত। বাকি রইল কেরল। কেরলের নির্বাচনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো পাঁচ বছর অন্তর রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল। সিপিএমের পিনারাই বিজয়নের সরকার চলার দরুন কেরল বিরোধীপক্ষ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট এমনিতেই কিছুটা সুবিধেজনক জায়গায়।

কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যত্র। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শরবীমালায় সাধারণ হিন্দুদের 'সেন্টিমেন্ট' নিয়ে যে রাজনৈতিক খেলা সিপিএম সরকার খেলেছে, তাতে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির' সঙ্গে সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়া— পায়ের তলার মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে সিপিএমের। আর সেই জায়গায় ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে বিজেপি। ওয়েনাড লোকসভা আসনটি গঠিত হয়েছিল ২০০৯ সালে এরপর থেকে দু'দুবার অর্থাৎ ২০০৯ ও ২০১৪ সালে কংগ্রেসের এম আই শানাভাস সেখানে জয়ী হন। শানাভাস গত বছরের শেষে প্রয়াত হন, তারপর থেকে আসনটি ফাঁকাই পড়ে আছে।

সুতরাং রাহুল গান্ধীর অঙ্ক খুব পরিষ্কার। একদিকে মৃত সাংসদের প্রতি সহমর্মিতা, অন্যদিকে কেরলের নির্বাচনী চরিত্র মোতাবেক সিপিএমের দুর্বলতর অবস্থান; আরেক পক্ষে মূলত মুসলমান ও কিছুটা খ্রিস্টান-অধ্যুষিত ওয়েনাডে শবরীমালা সূত্রে হিন্দু-ঝড়ের সম্ভাবনা কম— তাই গোটা ভারতবর্ষে যে কয়েকটি হাতে গোনা আসনে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে ওয়েনাড অন্যতম এবং তাই রাহুল গান্ধীর মুখরক্ষার অন্যতম ভরসাও বটে। জরুরি অবস্থার পর অত্যাচারী শাসক হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর পৌত্রের অপরিপক্ব বিরোধী হিসেবেই সেই রেকর্ড ভেঙে দেওয়া থেকে আটকাতে আপাতত কেরলই গন্তব্য।

অনেকেই বলছেন সর্বভারতীয় স্তরে মোদী বিরোধী জোটে (মতান্তরে জটে)-র ক্ষেত্রে কেরলে সিপিএমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটা সেমসাইড গোল নয়তো? কিন্তু সকলেই জানেন এই জোট আসলে ধান্দাসর্বস্ব বিরোধীদের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদ। সুতরাং যে যেখানে জিতবেন বলে ভাবছেন সেখানে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বার প্রশ্ন নেই। সে গোল সেমসাইডেই হোক বা অফসাইডে।

আর এই সন্দেহও তো রয়েছে যে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিক শক্তি কমিউনিস্টদের আদৌ কোনও প্রতিনিধি ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষে থাকবেন কিনা! সেদিক দিয়ে রাহুল গান্ধী অবশ্যই নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতিতে সেফসাইডে থাকছেন। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

দিদির চোখে দশ ভয়, বিজেপি আর সহজ নয়

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

লোকসভা নির্বাচন দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যকে এবার পাখির চোখ করেছে বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে বিজেপি ঝড় উঠলেও মোদী-হাওয়া থমকে গিয়েছিল মমতার রাজ্যে। মাত্র দুটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল গেরুয়া বাহিনীকে। এবার কিন্তু লড়াই অতটা সহজ নয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। তবে হ্যাঁ, যদি ভাবেন বিজেপিই একমাত্র ভয় তবে কিন্তু ভুল করবেন। দিদি নিজেই নিজেকে ভয় পাচ্ছেন। দলের ভাই, ভাইপোরাও চিন্তায় রেখেছে।

১। ২০১১ সালের পরিবর্তনের পরে পরেই ছিল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। রাজ্যে বিপুল হাওয়া ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। এবার সেটা অনেকটাই কম। ২০১১ থেকে ২০১৯। আট বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া তৈরি হয়েছে। সরকারি সুযোগ পাওয়া ও না-পাওয়া নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ বিক্ষোভ রয়েছে।

২। ২০১৪ সালের তুলনায় রাজ্যে কংগ্রেস কিংবা বাম দলগুলি অনেকটাই দুর্বল এবং কোথাও কোথাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। বিরোধী ভোটে ভাগ বসার সম্ভাবনা অনেকটাই কমেছে। তাই লড়াই সরাসরি।

৩। দিদির বড়ো চিন্তা ভাইপোকে নিয়ে। ভাইপো-বউ আবার বিদেশি না স্বদেশি তা নিয়েই নানা প্রশ্ন। সোনা পাচারের কেলেঙ্কারি! ভাবা যায়! আবার ভাইপোকে নিয়ে গোটা দলের ছোটো, বড়ো, মেজ, সেঝ সব নেতাই রেগে কাঁই।

৪। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গত পাঁচ বছরে অনেক গুণ বেড়েছে। এটা একটা বড়ো চিন্তা। অনেক আসনেই দলের মধ্যে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেটা দিদি প্রতিদিন টের পাচ্ছেন।

৫। কয়েকজন মাত্র নেতা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু দলের মধ্যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিজেপি-ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কেউই নাকি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন।

৬। গত লোকসভা নির্বাচনে জয়ী অনেক সাংসদই নিজের নিজের লোকসভা কেন্দ্রে কাজই করেননি। এটা তৃণমূলনেত্রী নিজেই স্পষ্ট করেছেন একগুচ্ছ প্রার্থী বদল করে। কিন্তু প্রার্থী বদলে দিলেই তো আর ভোটাররা সাত খুন মাপ করে দেবেন না।

৭। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট সেনাপতি ছিলেন মুকুল রায়। এখন তিনিই আবার প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রধান। বিজেপির হাতে মুকুল রায় থাকায় ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক অতীত কৌশলই বদলাতে হচ্ছে তৃণমূলকে। নির্বাচন কমিশন থেকে আধা সামরিক বাহিনী কাউকেই কবজায় আনা যাচ্ছে না।

৮। ২০১৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এই রাজ্যে সে ভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ চোখে পড়েনি। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেটা মারাত্মক ভাবে বেড়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে সে ছবিও দেখা গিয়েছে কোথাও কোথাও। সম্প্রতি ভারত-পাক সম্পর্ক নতুন করে সেই ইস্যুকে জাগিয়ে তুলেছে। এটা তৃণমূলের জন্য অবশ্যই চিন্তার। কারণ, তৃণমূলের অহেতুক অতি মুসলমান প্রীতির পরে হিন্দু-বন্ধু সাজার চেষ্টা কাজ করছে না।

৯। এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের বড়ো ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা। তাতেই খামতি দেখা দিয়েছে। দলের ভাবমূর্তিতে যে টান পড়েছে সেটা স্পষ্ট। সিন্ডিকেট থেকে গোষ্ঠী লড়াই বারবার সেটা সামনে এনে দিয়েছে। আর সব কিছুকে মেনে নিয়ে দিদিমণি নিজেই সাধারণ মানুষের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছেন।

১০। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসনে বিনা ভোটে জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলায় জেলায় বহু মানুষ ভোট দিতেই পারেননি। লোকসভা নির্বাচনে আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে তাঁরা কী করেন সেটা নিয়ে আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছে না তৃণমূল শিবির।

—সুন্দর মৌলিক

বামপন্থীরা নিজেদের বানানো সত্যেই শুধু আস্থাবান

অতিথি কলম

ড. মনমোহন বৈদ্য

এ বছরের জয়পুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য উৎসবে অংশগ্রহণ (JLF) করাকালীন আমার সঙ্গে এক উৎসুক তরুণীর দেখা হয়। মেয়েটি আমাকে জানাল, দেখুন, এরকম উৎসবে আলোচনার জন্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু বামপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব সব সময়ই পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তা বেছে নেওয়ার বিষয়েও বামপন্থী মনোভাবাপন্নরাই প্রাধান্য পান। এই সূত্রে সে যে টিম-এর অধীনে সাহিত্য উৎসব পরিচালনার কাজে অংশ নিচ্ছিল তিনি যে একজন স্বঘোষিত বামপন্থী কার্যকর্তা সে কথাও সে আলাদা করে আমাকে জানায়। এই বাম নেতা তাকে জানিয়েছিল যে বিখ্যাত গীতিকার প্রসূন যোশীকে সকলে চাইলেও এবারে তাঁকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কেননা কিছুকাল ধরেই তিনি দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে জনপ্রিয় 'মণিকর্ণিকা' ছবিতে তাঁর গান লেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি। আমরা দেখেছি বামপন্থীরা সাহিত্যকে বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহিত্য তাদের কাছে একটি অস্ত্র।

অবশ্যই সংগঠকদের হাতে অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। ঠিক দু'বছর আগে দত্তাত্রেয় হোসবালে ও আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে সে আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য শোরগোল উঠলেও কর্তৃপক্ষ তা ফেরায়নি। আমাদের জয়পুর সাহিত্য উৎসবে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ বহাল ছিল। এই বছর তারা রমেন পতংগেকে উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ পাঠায়।

আমার মতে এটি অত্যন্ত সদর্থক পদক্ষেপ। বাস্তবে এ বছর তারা প্রসূন যোশীকেও আমন্ত্রণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেননি। 'বামপন্থী কর্মীদের' কাজকর্ম নিয়েই মেয়েটি তার পর্যবেক্ষণের কথা আমাকে জানিয়েছিল।

এখন সময় এসেছে বামপন্থীদের ভণ্ডামির কথা সঠিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরার। একদিকে তারা নিজেরাই বাকস্বাধীনতা রক্ষার স্বঘোষিত যোদ্ধা। তাদের বক্তব্যের যে-কোনও যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতাকেও তারা নিজেদের মতের স্বাধীনতার ওপর আঘাত বলে মনে করে। একই সঙ্গে অন্য কোনও দৃষ্টিকোণ যা তাদের মনোমতো নয়, শুরুতেই জোর করে তার কণ্ঠরোধ করে দিতে তারা দ্বিধা করে না।

ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে নিজের মত ও চিন্তা প্রকাশের আবশ্যিক শর্ত। হিন্দুধর্মের এই মিলন ভাবনাই অনাদি কাল থেকে বিচিত্র সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষকে ভারতে শান্তিতে একত্রে বাস করার মন্ত্র দিয়েছে।

তাই দু' বছর আগে সংগঠকরা যখন আমাদের মতো দু'জন আর এস এস মতাবলম্বী বক্তাদের সেই প্রথমবার সম্মেলনে অংশ নিতে ডাকেন তখন স্বাভাবিক কারণেই বামপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবীণ সি পি এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি সাহিত্য উৎসবই বয়কট করেন। আর এস এস একটি তৃণমূল স্তরের সংগঠন যা শাসকশ্রেণীর সব ধরনের বিরোধিতা সহ্য করেও প্রসারিত হয়ে চলেছে। এর কারণ ভারতের মানুষের সমর্থন রয়েছে এই সংগঠনের পেছেনে। এই সূত্রে সঙ্ঘের পিছনে দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর জন্য ভারতের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ প্রাপ্য। আর ঠিক এই কারণেই সময়ের সঙ্গে মানুষের ওপর এই সংগঠনের প্রভাব বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে বামপন্থীরা অত্যন্ত নজরকাড়াভাবে নিয়মিত জনগণের ওপর তাদের প্রভাব হারাচ্ছে। হারাচ্ছে সমর্থন। পরিণতিতে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য আজ কেবলমাত্র দক্ষিণের একটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। গোঁড়া বামপন্থীদের সম্পর্কে আমার বক্তব্যের অনুমোদন পাওয়া যায় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক বিবেক অগ্নিহোত্রীর অভিজ্ঞতায়। তিনি সেই অনুভব তাঁর 'Urban Naxals' গ্রন্থে অকপটে লিখেছেন। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ও তার সঙ্গীসাথীরা বামপন্থী মহিলা প্রতিবাদীদের হাতে কিভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ সেখানে রয়েছে। বামপন্থী কর্মীরা তার 'Buddha

in a traffic jam' চলচ্চিত্রটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কী তুমুল বাধার সৃষ্টি করেছিল তাও জানা যায় বইটি থেকে। অগ্নিহোত্রী জানিয়েছিলেন তিনি শুধুমাত্র তার ছবিটি একবার দেখাতে চান, এক্ষেত্রে যার পচ্ছন্দ হবে না তিনি দেখবেন না। তারা উত্তর দিয়েছিল, না, কোনও অবস্থাতেই তিনি ছবি দেখাতে পারবেন না।

এবারে প্রথমে বলা জয়পুর সাহিত্যে উৎসবে কর্মকর্তা প্রসূন যোশীর মণিমর্ণিকা ছবির জন্য লেখা গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। গানটির লিরিক ছিল এরকম, 'ম্যায় রহুঁ না রহুঁ ভারত রহেগা' (আমি থাকি না থাকি এই ভারতদেশ থাকবে)। যে কোনও মানুষ একটু ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এমন একটি স্নিগ্ধ করুণ শব্দের পঙক্তি সম্পর্কে কারো আপত্তি করার কি কিছু আদৌ থাকতে পারে? ঠিক সেমেটিক (semitic religion যথা JEW ইত্যাদি) ধর্মাবলম্বীদের মতো বামপন্থীরাও সত্যের নিজেদের তৈরি একটি মাত্র অর্থে আস্থাবান। অন্য কোনও ব্যাখ্যা তাঁরা টিকতে দিতে রাজি নন। যদি কেউ তাঁদের সঙ্গে সহমত না হন সেক্ষেত্রে তাঁর মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রে তার বাঁচার অধিকারও আর থাকে না। এই বামপন্থী মতবাদই বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের বেশ কিছু জঘন্যতম অপরাধের জন্য দায়ী। আমাদের এই ভারতেও কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ যে দু'টি জায়গায় বামপন্থীদের গড় ছিল সেখানেও নিয়ম করে রাজনৈতিক খুন করাই ছিল এঁদের কাজ। বিরোধীদের এই ধরনের অসহিষ্ণুতা চিরাচরিত ভারতের অনুভব ও হিন্দুধর্মের বিরোধী। মানুষের চরিত্রে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনাই চিরন্তন ভারতীয় সমাজের চিন্তাবিন্দু। সকলের মধ্যেই আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে জ্ঞান এবং একাত্মতার (inclusiveness) তৈরি হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে নিজের মত ও চিন্তা প্রকাশের আবশ্যিক শর্ত। হিন্দুধর্মের এই মিলন ভাবনাই অনাদি কাল

“যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ক্ষুদ্র কায়েমি স্বার্থের কারণে এই মানসিকতাকে অন্তরে লালন করে বা নিজেদের অন্তঃসারশূন্য ধ্যানধারণাকে বামপন্থী গোষ্ঠীকে ধার দেয়—তাদের ভাবার সময় এসেছে।”

থেকে বিচিত্র সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষকে ভারতে শান্তিতে একত্রে বাস করার মন্ত্র দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমার স্বামী বিবেকানন্দের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। ভারত ও হিন্দু ধর্মের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কথা পাশ্চাত্যবাসীকে জানানোর পর তিনি তখন ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছেন। লন্ডন ছেড়ে দেশে ফিরবেন। সালটি ছিল ১৮৯৭। এই সময় তাঁর এক ইংরেজ বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করল ‘‘আচ্ছা স্বামীজী, দীর্ঘ চার বছরের বিলাস, বৈভব, শক্তি ও গরিমাময় পাশ্চাত্যে কাটানোর পর আপনি আপনার মাতৃভূমিকে কী চোখে দেখবেন? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, ‘‘দেখ, যখন আমি আমার ভারত ছেড়ে এসেছিলাম তখন তো আমি তাকে অবশ্যই ভালবাসতাম। কিন্তু এই দীর্ঘ প্রবাসের পর ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র হয়ে উঠেছে। সেখানকার বাতাসও আজ আমার কাছে পবিত্র। সেই সমগ্র ভারতভূমি আজ আমার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র হয়ে উঠেছে।

এরপর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে যখন তাঁর জাহাজ ভারতের তীরভূমির নিকটবর্তী হচ্ছিল তখন স্বামীজী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাতদুটি দিয়ে শরীরকে আবেষ্টিত করে আর্দ্র চোখে তটরেখার দিকে অপলকে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে ভারতমাতার মূর্তি যেন চাক্ষুষ প্রতিভাত হয়ে উঠছিল। যেই মাত্র তাঁর জাহাজ নোঙর ফেলল স্বামীজী দ্রুত জাহাজ থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে ভারতের মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করলেন এবং চরম প্রশান্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলেন ‘‘আমার যাবতীয় দুর্ভাবনা ও আশঙ্কার অবসান হলো। এই মাত্র আমি আমার ভারতমাতার কোলে এসে পৌঁছলাম।”

এই অতীত পরম্পরা থেকে আমরা আজ কী করে এখানে এসে পৌছলাম যেখানে এই ভারতে জন্ম নিয়ে, এই মানবতার মধ্যে দিয়ে শরীর পুষ্ট করে, আলো বাতাস জলে বড়ো হয়ে উঠে, এখানকার করদাতাদের টাকায় শিক্ষাগ্রহণ করে আমরা আওয়াজ তুলছি 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে'? যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ক্ষুদ্র কায়েমি স্বার্থের কারণে এই মানসিকতাকে অন্তরে লালন করে বা নিজেদের অন্তঃসারশূন্য ধ্যানধারণাকে বামপন্থী গোষ্ঠীকে ধার দেয়—তাদের ভাবার সময় এসেছে। সময় এসেছে তাদের আদর্শগত জোচ্চুরিকে পুনর্বিবেচনার মুখে ফেলার। যদি তারা তা না করে ভারতের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা তাদের কিন্তু 'সবক' শেখাবেই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

রম্যরচনা

চেকারকে বোকা বানানো

রেলের কর্মচারী এক ভদ্রলোক ভাগ্নেকে ছেলের পরিচয়ে রাঁচি নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ পরিবারের সদস্যরাই রেলের পাশ পাওয়ায় অধিকারী। আত্মীয়স্বজন নয়। চেকার এলে তিনি তাঁর আই কার্ড দেখালেন আর বললেন, সঙ্গেরটি তাঁর ছেলে।

হঠাৎ ভাগ্নে ডেকে উঠল মামা বলে। ভদ্রলোক ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। চেকার বললেন ছেলে যে আপনাকে মামা বলে ডাকছে। রেলকে আপনি ঠকাচ্ছেন। ফাইন দিন।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন— বাবা বলে ডাকলে ওকে কী আর রাঁচি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তো? বাবাকে মামা বলে ডাকছে, এটাও বুঝতে পারেন না? চেকার তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

উবাচ

"রাজা-মহারাজা নয়, চৌকিদারকেই দেশবাসীর প্রয়োজন। কারণ সেই চৌকিদার দেশের মানুষকে সর্বক্ষণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিরাপত্তা দেবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লিতে 'ম্যায় ভি চৌকিদার' সম্মেলনে

"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভয় পায় বিরোধীরা। সেই কারণেই তারা একজোট হয়েছে।"

অমর সিংহ
প্রাক্তন সমাজবাদী নেতা

উত্তরপ্রদেশে সপা-বসপা-আর এল ডি জোটকে কটাক্ষ করে

"আগে আমাকে, এখন অর্জুনকে গদ্দার বলা হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকেই আমরা গদ্দারি শিখেছি।"

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

তৃণমূল ত্যাগীদের মমতার গদ্দার বলার পরিপ্রেক্ষিতে

"পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাপ্রবণ রাজ্য, তাই সাত দফায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

বিবেক দুবে
পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক

রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের শেষে মন্তব্য

"৫৬ দলের জোট নয়, দেশ চালাতে পারে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি।"

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ
মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

ওয়ার্ধায় নির্বাচনীসভায় বক্তব্যে

উনিশের নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার বিদেশি ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান

সাধন কুমার পাল

২০১৯-এর নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভারত এখন রণক্ষেত্র। ক্ষমতাসীন বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিরোধী দলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সীমা লঙ্ঘন করে দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরোধিতা, সেনাবাহিনীর বিরোধিতায় নেমে পড়ছেন। বিরোধী নেতাদের বক্তব্যকে হাতিয়ার করে চীন পাকিস্তানের মতো দেশ বিশ্বের দরবারে সরাসরি ভারতকে কাঠগড়ায় তুলছে। প্রশ্ন উঠছে বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে দেশ বিরোধিতা কোনও বিদেশি ষড়যন্ত্রের অঙ্গ নয় তো? নির্বাচনের দামামা বেজে ওঠার আগেই সৈয়দ সুজা নামে আমেরিকা ভিত্তিক একজন স্বঘোষিত ভারতীয় সাইবার এক্সপার্ট কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বালকে পাশে বসিয়ে লন্ডনে প্রেস কনফারেন্স করে অভিযোগ করেন যে ওর কাছে পাকাপোক্ত প্রমাণ আছে যে ২০১৪ সালে ইভিএম হ্যাক করেই নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করা হয়েছিল। বিদেশের মাটিতে বসে করা অভিযোগের ধরন দেখে এটা স্পষ্ট করেই বলা যায় দেশ জুড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

যে-কোনো নির্বাচনের আগে বিভিন্ন মসজিদের মোল্লা মৌলভি ও বিভিন্ন গির্জার ফাদারদের ফতোয়াগুলিতে চোখ রাখলেই ভারতে মুসলমান ও খ্রিস্টান নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার প্রয়াস স্পষ্টতই চোখে পড়বে। এই সমস্ত ফতোয়ার পিছনে আন্তর্জাতিক চার্চ সংগঠন, বিদেশভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থার যোজনাবদ্ধ প্রয়াস এবং বিদেশি অর্থের প্রভাব নেই একথা হলফ করে বলা যাবে না। এদেশের মাওবাদীরা ভোট বয়কট নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো দলকে সমর্থন করে থাকে। যেমন মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে সদ্য অনুষ্ঠিত ছত্তিশগড়ের বিধান সভা নির্বাচনে মাওবাদীরা বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য গোপনে সরাসরি কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তো প্রকাশ্যেই বলেছে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু হবে। কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পাকিস্তানের সাহায্য চেয়ে রেখেছেন। পাকিস্তানের মোল্লা মৌলভিরাও ভারতীয় মুসলমানদের নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করার আবেদন রেখেছেন। এরকম একটি পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন উঠে ভারতের বিরোধী দলগুলির হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দিতে নির্বাচনের আগে ইচ্ছে করেই পুলওয়ামার সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটানো হয়নি তো? পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে পাকিস্তানের হয়তো বিশ্বাস ছিল পাকিস্তানের ভিতরে আক্রমণ করার সাহস ভারত দেখাবে না। কিন্তু পাকিস্তানের দম্ভ গুড়িয়ে দিয়ে বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকের পর ভারত সরকারের দৃঢ়তা ও বায়ুসেনার পরাক্রম দেখে সমস্ত ভারতকে আত্মবিশ্বাসের আলোতে ঝলমলিয়ে উঠতে দেখে শুধু পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি নয় ভারতের বিরোধী দলগুলিও ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। পাকিস্তানের দম্ভ গুড়িয়ে দেওয়ার জেরে দেশজুড়ে তৈরি হওয়া উচ্ছ্বাস আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটে রূপান্তরিত হয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির ভোট বাক্স ভরিয়ে দেবে না তো? সংশয় ছড়িয়ে পড়ে বিরোধী শিবিরে।

এই আশঙ্কা থেকেই প্রমাদ গুনলেন মমতা-রাহুল-অখিলেশ- কেজরিওয়ালদের মতো ভারতের বিরোধী নেতারা। নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণের নামে বায়ুসেনার পরাক্রম নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন। ভারত বিরোধী বিদেশি মিডিয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে এয়ার স্ট্রাইকে কতজনের মৃত্যু হয়েছে শুধু তার প্রমাণ চেয়ে থেমে থাকলেন না, নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন আসলে পাকিস্তান নয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিশ্বের দরবারে কোণঠাসা পাকিস্তান ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি ভারতের বিরোধী নেতাদের বক্তব্য হাতিয়ার করে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করলো। চীনের আপত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মাসুদ আজহারকে গ্লোবাল টেরোরিস্ট ঘোষণা আটকে যেতেই উচ্ছ্বসিত বিরোধীরা যেন আবার ফ্রন্ট ফুটে এসে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতে শুরু করলেন। রাহুল গান্ধী প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে চীনের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ না করে বললেন নরেন্দ্র মোদী নাকি চীনের প্রেসিডেন্টকে ভয় পান। এর থেকে স্পষ্ট বিরোধীরা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য ভারতের স্বার্থ বিরোধী কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের পদক্ষেপকেও স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

উরি হামলা ও তার জেরে হওয়া সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটের হামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর থেকে মমতা ব্যানার্জি, রাহুল গান্ধী, দিগ্বিজয় সিংহ, নভোজ্যোত সিংহ সিধু, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদববের মতো অনেক বিরোধী নেতাই এখন পাকিস্তানি মিডিয়ায় হিরো। সমস্ত বিশ্ব সমর্থন জানালেও নির্বাচনের মুখে সন্ত্রাস মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে মোদী সরকারকে হেনস্থা করে যে ভাবে পাকিস্তানের সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে তাতে কিন্তু এই শত্রু দেশটির কলকাঠি নাড়ার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খুব সাধারণ যুক্তিতেই বোঝা যায় ভারতের বিরোধী দলগুলির প্রো-পাকিস্তানি অবস্থান দেখে পাকিস্তান লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারকে হেনস্থা করার রসদ জুগিয়ে ভারতের বিরোধী নেতাদের হাত শক্ত করার কোনো সুযোগই

হাতছাড়া করতে চাইবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, বিভিন্ন ধর্মীয় জমায়েত থেকে গুজব ছড়িয়ে বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মনে বিজেপি বিরোধী ঘৃণা ও ভয়ের ভাব তৈরি করতে যে পাকিস্তান সক্রিয় ভূমিকা নেবে এই বিষয়েও খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই।

লাদেনের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ার পর কেউ ওসামার লাশ দেখতে চেয়েছে বা প্রমাণ চেয়েছে এমন নজির নেই। পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতীয় বিমান হানার পর সমস্ত বিশ্ব ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে একযোগে পাকিস্তানের নিন্দা করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, আত্মরক্ষার অধিকারকে কুর্নিশ জানিয়েছে সমগ্র বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে চরম শিক্ষা দিয়ে ভারতকে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের কালো ছায়া থেকে মুক্ত করার মতো পরিবেশ যখন নির্মাণ হয়েছে ঠিক সেই সময় কয়েকটি বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডাকে অবলম্বন করে ভারতের ভিতর থেকেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো। কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ পুলওয়ামার ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করে এটিকে সন্ত্রাসবাদী হানা বলতেই নারাজ। বিমানবাহিনী বালাকোটের জঙ্গলে বোমা ফেলে গাছ উপড়ে এসেছে এমন কথাও বলছেন বিরোধীরা।

উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের মুক্তির ঘটনাকে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য না বলে বিরোধীরা পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা বলে প্রচার করছেন। পাকিস্তানি মিডিয়া ভারতের বিরোধী নেতাদের বক্তব্য ফলাও করে প্রচার করেছে। সন্দেহ নেই ভারতের বিরোধী নেতাদের ভূমিকা ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করে পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক মহলে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ভারতের মধ্যে এই অনৈক্যের বার্তা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, পাকিস্তান বা চীনের মতো বৈরী দেশগুলিকে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালাতে উৎসাহিত করবে, বিপাকে ফেলতে উৎসাহ জোগাবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে, ভারতের বিরোধী নেতারা পাকিস্তানের ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডার মাধ্যম হয়ে উঠলেন না তো?

১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর কান্দাহারে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের আইসি ৮১৪ বিমানের যাত্রীদের ছাড়ানোর জন্য ভারতে মিছিল মিটিং, প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের সামনে ধরনা প্রদর্শনের ঘটনায় সমস্ত দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে সময় কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার। বিরোধীরাও মাসুদ আজহার- সহ সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে হলেও যাত্রীদের মুক্তি চাইছিলেন। মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর নিরন্তর চোখ রাখছিল সন্ত্রাসবাদীরা। মিডিয়ায় প্রচারিত একটি সাক্ষাৎকারে অজিত দোভাল (বর্তমানে ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার)-কে বলতে শোনা গেছে তিনি যখন যাত্রীদের মুক্ত করার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছিলেন সে সময় সন্ত্রাসবাদীরা বারবার এটাই বলছিলেন যে, 'তোমার দেশের মানুষ সমস্ত দাবি মেনে যাত্রীদের মুক্তির কথা বলছে, কোন অধিকারে এখানে তুমি দরকষাকষি করছ?' দোভাল আরও জানান যে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় মিডিয়ার তুলে ধরা সমস্ত তথ্য সন্ত্রাসবাদীরা এমন ভাবে উল্লেখ করছিল যে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। শ্রী দোভালের এই সাক্ষাৎকার থেকে এটা স্পষ্ট যে সন্ত্রাসবাদ কিংবা চীন পাকিস্তানের মতো দেশের ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডা মোকাবিলার পথে প্রধান সমস্যা ভারতের অন্তঃসার শূন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সিংহভাগ ভারতীয় মিডিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হলেও ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডা বিস্তারে সাহায্য করে থাকে।

ভারতীয় রাজনীতির চলমান গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সমগ্র দেশ এমন স্পষ্টতই দুইটি রাজনৈতিক মেরুতে বিভক্ত। একটি হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বার্থ কেন্দ্রিক রাজনীতি যাতে সবার উপরে 'ব্যক্তি কিংবা দল' সত্য, তার উপরে নাই। আরেকটি 'বৃহত্তর স্বার্থ' কেন্দ্রিক রাজনীতি যাতে সবার উপরে 'দেশ সত্য' তার উপরে নাই। বিগত পাঁচ বছরে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির সস্তা পথে না হেঁটে দেশের বুনিয়াদি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নোট বাতিল, জিএসটি, স্বচ্ছভারত, জনধন যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অ্যাকশন প্ল্যানের মতো বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসা সস্তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির দেশের বুনিয়াদি ব্যবস্থাগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও বৃহত্তর স্বার্থে ভারতবাসী হাসি মুখে এই সমস্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে জনমোহিনী রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এই ধরনের 'ভোট বিমুখ' সিদ্ধান্তের নজির খুব একটা নেই। কিন্তু এই সমস্ত প্রকল্প নিয়ে বিরোধীদের সেই প্রচলিত সস্তা রাজনৈতিক সংস্কৃতিজাত আক্রমণের ভাষা ও ভাব লক্ষণীয়। বিরোধীরা এই সমস্ত কঠোর সিদ্ধান্তের পিছনেও ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, ভোটের রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। যেমন, নোট বাতিলের গায়ে ভারতের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতির তকমা দিয়ে দেশবাসীকে এটা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষের স্বার্থে এই নোট বাতিল করা হয়েছে। জিএসটিকে 'গব্বর সিংহ ট্যাক্স' বলে কটাক্ষ করে এই নতুন কর ব্যবস্থায় মানুষের প্রাথমিক সমস্যাগুলিকে উস্কে দিয়ে একটি অনাস্থার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই যে দেশের রাজনীতিতে রাজনীতির নামে বিরোধিতার কোনো লক্ষণরেখা নেই, মর্যাদার কোনো সীমারেখা টানা নেই সেই দেশের নির্বাচনে বিদেশি শক্তি অতি সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারে।

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলিও যে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে সেটাও ইতিমধ্যে প্রমাণিত। ২০১৮ সালে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের সময় কেমব্রিজ এনালটিকার মতো বিদেশি কোম্পানি ভারতীয়দের সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য চুরি করে বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অভিযোগে ভারতীয় রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। উনিশের নির্বাচনে বিদেশি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ভারতে 'বৃহত্তর স্বার্থ কেন্দ্রিক' রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করার বড়ো সুযোগ উপস্থিত।

এই নির্বাচনকে কোনো দল বিশেষের জয়-পরাজয় হিসেবে না দেখে ভারতীয় রাজনীতির গুণাত্মক পরিবর্তনের সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। এই সুযোগ ভারতবাসী কতটা কাজে লাগাবে তা দেখার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। ■

চোরেরা তফাত যাও

রাহুমুক্ত হোক পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা

সনাতন রায়

শিরোনাম দেখেই দয়া করে 'রে রে' করে উঠবেন না। দয়া করে পথে নামবেন না বিযোদ্গার করতে অথবা আদালতে ছুটতে এই অভিযোগ নিয়ে যে সাংবাদিকদের অপমান করা হয়েছে।

না। বিশ্বাস করুন, এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের গোটা সাংবাদিককুল নন। এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই সাংবাদিকরাই যাঁরা যৎসামান্য ভিক্ষের দান দু-হাত পেতে নেবার জন্য একটি রাজনৈতিক দল এবং ওই দলের নেতা-নেত্রীদের কাছে নিজেদের মাথা এবং কলম বেচে দিয়েছেন। এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য সেইসব গুটিকয় সাংবাদিক যাঁরা চিটফান্ডকে চিট করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ গরিব মেহনতি বাঙ্গালিকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছেন। এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য সেইসব তৃতীয় শ্রেণীর সাংবাদিক যারা একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীর পিছন পিছন ল্যাং ল্যাং করে ঘোরেন বলে অন্য সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের গর্বের পরিচয়— সারমেয় বাহিনী বা ডগ স্কোয়াড।

এ প্রতিবেদন লেখার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। তা হলো বাংলা সাংবাদিকতার সম্মান রক্ষার্থে চোখ কান মুখ গুঁজে বসে থাকা সাংবাদিকদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া— আপনাদের 'দেখব না, শুনব না, বলব না'-মুখী হাবভাব বাংলা সাংবাদিকতাকেই অপমান করা। এটি সেই স্বসম্মানিত বাংলা সাংবাদিকতা যা সাংবাদিক রাজা রামমোহন রায়কে বলতে শিখিয়েছিল— 'হৃদয়ের শত শত ফোটা শোণিতের বিনিময়ে অর্জন করেছ যে অমূল্য সম্মান, প্রিয় মোর, তুচ্ছ দারোয়ানের অনুগ্রহ পাবার আশায় তাকে কোর না বিক্রয়।'

এ প্রতিবেদনের তৃতীয় উদ্দেশ্য— রাজ্যের সৎ সাংবাদিককুলকে আহ্বান জানানো— আত্মশ্লাঘার রোষে না জ্বলে জেগে উঠুন। ভয়কে জয় করে প্রতিবাদের ঝড় তুলুন। অন্তত একটু আওয়াজ তো উঠুক এই বলে যে, ভারতীয় সাংবাদিকতার আঁতুড়ঘর বাংলা সাংবাদিকতার মহান ঐতিহ্যকে কতকগুলি অবিমৃশ্যকারী সাংবাদিক পরিচয়ধারী সরকারের পোষা চাকরের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেব না। তাদের হাতজোড় করে অন্তত বলি, 'অনেক হয়েছে, এবার আসুন। আমাদের বাঁচতে দিন।'

হ্যাঁ। আমি নিজেও একজন সাংবাদিক। আমি বিশ্বাস করি, আমার বাঁচার অধিকার আছে সসম্মানে। আমি দাবি করি, সাংবাদিকতা পেশাটিকে যারা ভূলুণ্ঠিত করছে, প্রয়োজনে তাদের চাবুক মেরে বিদায় করা উচিত। ওদের দু-গালে চপেটাঘাত করে বলার সময় এসেছে— তুমি চোর হতে পারো, কিন্তু তোমার চুরির দায় আমি নেব কেন? কোনো মানুষ তাচ্ছিল্য করে বলবেন— 'সাংবাদিক মানেই তো চোর। সবকটাকে জেলে পোরা উচিত।'

কারা ওঁরা? মাননীয় সাংবাদিকবৃন্দ, আপনারা এদের সবাইকে চেনেন। যিনি জেলে ছিলেন, যিনি জেলে গেলেন এবং আগামীদিনে যাঁরা যাবেন— তাঁরা সবাই আপনাদের চেনা। আর চেনেন তাঁদেরও যাঁরা 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' প্রবাদবাক্যটির প্রকাশ্য ফলাফল দেখেও ধীরে ধীরে পাপাশ্রয়ীই হয়ে পড়ছেন।

প্রত্যেককে আমি চিনি, জানি। প্রত্যেকের নাম করে লিখতে পারতাম এরা কারা? কী এদের পরিচয়? করছি না সৌজন্যের খাতিরে। কারণ কলকাতার বাংলা সাংবাদিকতার বাজারে এখন অনেক নতুন মুখ যারা ভালোবেসে সাংবাদিকতা করছেন। যারা সম্মান বজায় রেখে কাজ করছেন। তাদের মনোবল ভেঙে দিতে চাই না এবং চাই না পাপাশ্রয়ী সাংবাদিকদের মুখোশ ছিঁড়ে দিয়ে ওই কচিকাঁচা সাংবাদিকদের সামনে তাদের এখনই অপমানিত করতে। হয়তো একদিন তা করতেই হবে। তাই আপাতত শুধু ইঙ্গিতে বলি, বাংলা সাংবাদিকতার কুলাঙ্গারগুলির অধুনা পরিচয়।

কুলাঙ্গারদের শিরোমণি এখন জেলে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি চিটফান্ডের মালিকের ২২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর ৩২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান মিলেছে। কিছু তাঁর নামে, কিছু তাঁর স্ত্রীর বা আত্মীয়দের নামে। গোটা ভারতবর্ষে তাঁর নাকি ১৩টি ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এবং বীজগণিতের নিয়মেই সম্ভবত তিনি যে সংবাদপত্রের কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন, সেই সংবাদপত্র ওই চিটফান্ডের মালিককে বিদেশের মাটিতে সেরা বাঙ্গালির সম্মান জানিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, এই অতি ঝানু সাংবাদিক মহাশয়ের নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং তিনি কয়েকটি ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নিয়মিত নগদ মাসোহারা প্রাপকও। তিনি রাজ্যের বাম নেতাদের অনুগ্রহে নিজেকে প্রায় দেউলিয়া ঘোষণা করে সমবায় পদ্ধতিতে লবণ হ্রদের অতি দামি অঞ্চলে দু'খানি ফ্ল্যাট বাগিয়েছিলেন এবং পরে তা শ্বশুরমহাশয় এবং শ্যালিকার নামে ট্রান্সফার করেন যা বিক্রিরই নামান্তর এবং অবশ্যই চড়া মূল্যে। তাঁর উত্থানের নেপথ্য নায়ক ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও সাংসদ যিনি তাঁকে হাত ধরে রাজনীতির খুঁটিনাটি শিখিয়েছিলেন হয়তো না জেনেই যে ওই বীরপুঙ্গব সাংবাদিকটি দিল্লির মসনদ থেকে লাহোর-করাচীর মাটিতেও তাঁর

রাজ্য সরকার প্রকারান্তরে দখল নিয়েছে কলকাতা প্রেস ক্লাবের। এদেরই মদতে সমস্ত সাংবাদিক ইউনিয়নগুলিকে প্রায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের নেতারাও বিকিয়ে গেছেন অর্থের প্রলোভনে। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ আজ শুধুই শাসকের সংবাদ।

পক্ষ বিস্তার করবেন। আরও আছে, তার নামে ইতিমধ্যেই কয়েকজন মহিলা 'মি টু' কলমে বলপূর্বক যৌনাচারের অভিযোগ এনেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর বিদেশে পাঠরতা কন্যার বয়সি সহকর্মিণীও।

আর এক শিরোমণি এখন প্রকাশ্যেই পরিচিত যিনি অভিযুক্ত সারদা চিটফান্ড মামলায়। প্রায় তিন বছর জেলে পচার পরও তাঁর গলাবাজি বন্ধ হয়নি এবং প্রায় গোটা পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আদালতে হাজিরা দিতে থাকা এই কলমচি ছিলেন রাজ্যের শাসকদলের সাংসদ এবং দলসুপ্রিমো নেত্রীর সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তিনি নাকি কোনরকমে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন এবং জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার প্রশ্রয়ে এবং আশ্রয়ে তিনি খবরের কাগজের জগতে পদার্পণ করেছিলেন। সামান্য হাতখরচের বিনিময়ে যিনি সাংবাদিকতা করতেন, সেই মহান সাংবাদিকটি চিটফান্ডে মামলায় অভিযুক্ত হলেন যখন জানা গেল, সারদা চিটফান্ড গোষ্ঠী তাকে বেতন দিত মাসে ১৬ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে গাড়ি এবং অন্যান্য সুবিধা। উত্তর কলকাতার বনেদি পাড়ায় তাঁর দুটি ফ্ল্যাট। বাকি বেনামা সম্পত্তির খবর এখনও প্রকাশিত হয়নি বা অগম্য হয়ে রয়েছে।

জেলের বা হাজতের মুখ এখনও দেখেননি, কিন্তু ইতিমধ্যেই দু'বার এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তিনি হলেন পরবর্তী শিরোমণি। এক সময়ে তিনি একটি সংবাদপত্রের অধীনে চালু হওয়া সাপ্তাহিক টেলিভিশন প্রোগ্রামের ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল ফ্ল্যাশ বাল্ব বয়ে বেড়ানো এবং ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করা। সেখান থেকেই তিনি হঠাৎ 'সাংবাদিক' হিসেবে গজিয়ে উঠলেন একটি বেসরকারি টেলিভিশন প্রোডাক্টে যেটির প্রযোজক সংস্থা ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম এক কয়লা মাফিয়া। ওই গ্রুপের তিনজন (একজন মহিলা-সহ) সকলেই চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত এবং জেলবাস করছেন। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় আসায় আগে থেকেই তিনি নেত্রীর সঙ্গে অশুভ গাঁটছড়া বাঁধেন এবং শাসকদল ক্ষমতায় আসার পর ওই বীরপুঙ্গব সাংবাদিক একটি বৃহৎ বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠেন কোনও এক যাদুমন্ত্রে। ওই সাংবাদিকটি একসময় একটি চ্যানেলে কাজ করার সময় শিল্পপতিদের ধরে বেড়াতেন অর্থ বিনিয়োগের জন্য। কারণ তখন তাঁর মাসমাহিনাটাও অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু গত ৭/৮ বছরের মধ্যে ওই সাংবাদিক রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকটি কমিটির চেয়ারম্যান এবং সব কমিটি থেকেই তাঁর জন্য বরাদ্দ একটি করে গাড়ি ও মাসিক ভাতা। নবান্নে তিনি নামে বেনামে ৪০টি গাড়ি ভাড়া খাটান। হাওড়ায় পড়শিদের চমকে তিনি জলের দরে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি অনেকগুলি জমি কিনেছেন এবং নামে অথবা বেনামে বানিয়েছেন রেস্তোরাঁ ও বার। তিনি ইংরেজি বলতে পারেন না। হিন্দি বলতে পারেন না। এমনকী ভালো প্রশ্নও করতে জানেন না। কারণ তাঁর পড়াশোনা নেহাতই অল্প। অতএব ধান্দাবাজির চিন্তাভাবনা করতে করতে চাণক্যের মতোই মাথায় টাক পড়লেও সুযোগসন্ধানী চরিত্রটির অপনোদন ঘটেনি। তাই টেলিভেশনের পর্দায় না দেখা গেলেও তাঁকে দেখতে পাবেন ইউটিউবে যিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গানে গলা মেলাচ্ছেন মধ্যরাতে কোনো হোটেলের লবিতে। দেশের অন্যত্র বা দেশের বাইরে গেলে সাংবাদিকদের প্রায় সবাই অন্য হোটেলে উঠলেও তিনি এবং আরও একজন থাকেন মুখ্যমন্ত্রীর হোটেলেই। এমনকী ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক ব্যবসায়ী সংস্থার মালিকের মেয়ের বিয়েতেই তাঁকে একঝলক দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর 'বেয়ারা'র ভূমিকায়।

কুলাঙ্গারদের দলে রয়েছেন আরও এক প্রবীণ সাংবাদিক যিনি বরাবরই নেত্রীর কোলঘেঁসা। এক সময়ে দিল্লিতে পোস্টিং পাবার পর মাথার ছাদ না থাকায় থাকতেন এক নেত্রীর কোয়ার্টারে। সেখান থেকেই তাঁর গাড়ি বাড়ি সবকিছু। এখন তিনি বিধায়ক। সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ এখনও শোনা যায়নি। কারণ উনি গভীর জলের মাছ। তাই নেত্রীর মতোই সততার প্রতিমূর্তি সেজে থাকলেও এ প্রশ্নের জবাব তো তাঁকেই দিতে হবে যে কেন একজন সাংবাদিক হয়ে বিনা পয়সায় থাকার জন্য তিনি একজন রাজনৈতিক নেত্রীর কোয়ার্টারে থাকতেন? যা মাইনে পেতেন, তাতে গাড়ি চড়ার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু কলকাতায় ফেরার পরই কোথা থেকে পেলেন গাড়ি? আর কেনই বা একজন সাংবাদিক বিধায়ক হবার পুরস্কার পেলেন শাসক দলের কাছ থেকে?

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। কলকাতার একদা বামপন্থী একটি সংবাদপত্রের এক সাংবাদিক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লন্ডন ভ্রমণে গিয়ে রুপোর চামচ চুরি করে ধরা পড়লেন। তিনি আবার বিখ্যাত এক বামপন্থী লেখকের পুত্র এবং একজন ডব্লিউ বি সি এস অফিসারের স্বামী এবং বিদেশে গবেষণারত অত্যন্ত মেধাবী এক ছাত্রের পিতা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ধরা পড়ার পরও তিনি বহাল তবিয়তে ৬৫ বছর বয়সেও চাকরিতে বহাল রয়েছে। কারণ বামপন্থী সংবাদপত্রটি এখন ঘাসফুলের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে নতুন মালিকানায় যে মালিকটি সাহিত্যের 'স' না বুঝেও 'সাহিত্যিক' হয়েছে এবং নেত্রীর বিদেশযাত্রার সঙ্গী হন সম্ভবত স্পনসর হিসেবে। আর সংবাদপত্রটিকে যিনি সংবাদপত্র করে রেখেছিলেন দীর্ঘ তিন দশক, সেই অতিবাম সম্পাদক মহাশয় এখন সংবাদপত্রে ঘাসফুলের বীজ রোপণ করছেন একটি শর্তেই ২৫ লক্ষ টাকার মাসিক বেতনটি বন্ধ করা যাবে না।

ওই সংবাদপত্রেই বাজারি বৃহৎ সংবাদপত্রের এক সাংবাদিককে চালান করেছেন নেত্রী। তিনি সবজান্তা বেঁটে সর্দার। যাঁরা এতদিন ধরে সংবাদপত্রটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁদের ওপরই ছড়ি ঘোরানোর কাজটি তিনি করে চলেছেন 'লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়' প্রবাদবাক্যটিকে আপ্তবাক্য হিসেবে স্মরণ করে। কারণ তিনি নেত্রীর পছন্দের মানুষ। তাই মালিকেরও পছন্দের সাংবাদিক। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সম্পাদকের চেয়ারটিও বরাদ্দ হবে তাঁরই জন্য যদি কোনো চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত না হন।

শোনা যাচ্ছে, চিটফান্ড দুর্নীতিতে জড়িয়ে রয়েছেন মোট ২১ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে একদা নকশাল নেতা বলে পরিচিত সাংবাদিকটি আছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু যিনি একদা গর্ব করে বলে বেড়াতেন, লালবাজারে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে দুর্ধর্ষ অফিসার রুণু গুহনিয়োগী তাঁর হাত পা সব ভেঙে দিয়েছিলেন, তিনিই হঠাৎ করে ২০১১ সালে ঘাসফুল নেত্রীকে 'প্রকৃত বামপন্থী' বলে প্রচার শুরু করে নেত্রীর সম্ভ্রম আদায় করে নিলেন এবং দলীয় পত্রিকা যার মুখও দেখা যায় না, তার সম্পাদক হয়ে উঠলেন মাসিক ৮৫ হাজার টাকা বেতনের বিনিময়ে। এই টাকাটা চিটফান্ডের টাকা কিনা জানা নেই। তবে এটা ঠিক, অর্থ আদায়ের মোক্ষম দাওয়াইটি হস্তগত করলেও কলকাতার সাংবাদিক মহলে বিশেষ মুখটুক দেখান না। বোধহয় লজ্জায়। নকশাল নেতা ছিলেন বলে কথা।

একজন ভারতবিখ্যাত প্রয়াত সাংবাদিকের কুলাঙ্গার তনয়টিও চিটফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত কিনা জানা নেই। তবে তিনি যে সারমেয়

বাহিনীর অন্যতম তা সব সাংবাদিকই জানেন। তিনিও সরকারের দয়ায় একটি বৃহৎ টেলিভিশন চ্যানেলের সম্পাদক। যোগ্যতা? সে না হয় শিকেয় তোলা থাক।

ঠিক এইভাবেই শাসককর্ত্রীর বাহিনীতে রয়েছেন 'অতিবিখ্যাত' এক কেন্দ্রীয় টেলিভিশনের সাংবাদিক,বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি বামপন্থী সংবাদপত্রের এক প্রাক্তন সাংবাদিক, একটি ইংরেজি দৈনিকের অতি চালবাজ এক সাংবাদিক, একটি বাংলা দৈনিকের এক মহিলা সাংবাদিক যিনি নেত্রীকে দেবীরূপেই গুণ গান এবং এই জাতীয় আরও কিছু সাংবাদিক যারা এক বা একাধিক সরকারি কমিটির কর্তাব্যক্তি বা সদস্য, নিয়মিত ভাতা পান এবং সামান্য প্রসাদের অপেক্ষায় ভিক্ষের হাত পেতে বাংলা সাংবাদিকতাকে লাঞ্ছনা করছেন প্রতিদিন অহোরাত্র। এরা ভুলে গেছেন রাজা রামমোহন রায়কে, হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, দাদাঠাকুরকে, কাঙাল হরিনাথকে, মহাত্মা শিশির ঘোষকে। এরা ভুলে গেছেন ঋষি অরবিন্দকে, বাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, এমনকী বরুণ সেনগুপ্তকেও। এঁরা ভুলে গেছেন, এই বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট অব দ্য অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার। বাংলাতেই জন্ম দ্বিতীয় সংবাদপত্র ইন্ডিয়া গেজেট, তৃতীয় সংবাদপত্র ক্যালকাটা গেজেট, প্রথম ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) প্রকাশিত সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ, ভারতীয় মালিকানায় প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় ভাষা (বাংলা)-য় প্রকাশিত সংবাদপত্র বঙ্গাল গেজেটি, প্রথম দৈনিক সংবাদ প্রভাকর। প্রথম উর্দু পত্রিকা জান-ই-জাহাননুমা, প্রথম সান্ধ্য দৈনিক সন্ধ্যা, প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র উদন্ত মার্তণ্ড। প্রথম বহু ভাষিক সংবাদপত্র বেঙ্গল হেরাল্ডেরও জন্ম হয়েছিল এই বাংলার মাটিতেই। বাংলার মাটিতেই প্রকাশ পেয়েছিল প্রথম সচিত্র বাংলা পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিন্দু প্যাট্রিয়ট, প্রথম দ্বিভাষিক পত্রিকা (সমাচার সুধাবর্ষণ), প্রথম বাণিজ্যিক সংবাদপত্র মহাজন দর্পণ, প্রথম মহিলাদের জন্য মানসকপত্র সুগৃহিণী, মফস্‌স্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র মুর্শিদাবাদ নিউজ, বামপন্থী সংবাদপত্র জনযুদ্ধ। এমনকী ভারতবর্ষে প্রথম ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট হিসেবে স্বীকৃত যিনি, সেই মাইকেল মধুসূদন দত্তও বাঙ্গালির গর্বের মধুকবি।

সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগে জেলবন্দি করার। লেখা তো দূরের কথা, স্পষ্টভাবে কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র কিছু সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে (তাও টাকা মেলে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে) আসল সংবাদগুলিকেই ছাপার অধিকার দেয় না। কারণ এ যুগের মালিকদের প্রথম দায় অর্থ, সংবাদ নয়।

অত্যন্ত সমৃদ্ধ সেই ইতিহাস। অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম, অনেক অত্যাচার, অনেক চোখের জলে গড়ে ওঠা বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ না হলে এইসব গুটিকয় অর্বাচীন সাংবাদিক এমনভাবে মাথা বিকিয়ে দিতে পারতেন না। নিজেদের মাথা যাকে খুশি বিক্রি করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু এঁদেরই মদতে আজ রাজ্যের সরকার এবং শাসকদল অন্য সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগে জেলবন্দি করার। লেখা তো দূরের কথা, স্পষ্টভাবে কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র কিছু সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে (তাও টাকা মেলে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে) আসল সংবাদগুলিকেই ছাপার অধিকার দেয় না। কারণ এ যুগের মালিকদের প্রথম দায় অর্থ, সংবাদ নয়। তাই আলু বা পটোল বেচার মতোই করেই বিক্রি করছেন সংবাদপত্র।

এইসব সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। এদেরই মদতে রাজ্য সরকার প্রকারান্তরে দখল নিয়েছে কলকাতা প্রেস ক্লাবের। এদেরই মদতে সমস্ত সাংবাদিক ইউনিয়নগুলিকে প্রায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের নেতারাও বিকিয়ে গেছেন অর্থের প্রলোভনে। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ আজ শুধুই শাসকের সংবাদ। শোষিতের কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছে মাথার ওপর জল্লাদের খড়্গকে তুলে ধরে। কার ঘাড়ে কখন কোপ পড়বে কেউ জানে না।

এসব অন্যায় ও অবিচার কি আমরা মাথা পেতে মেনে নেব? কেউ কি নেই যে অন্তত একবার হাতটা তুলে বলতে পারে, দাঁড়াও বন্ধুরা। তোমরা চোর। চুরি কর। শান্তি দেবার দায় যাদের তারা দেবে। কিন্তু তার আগে তোমার গলা থেকে সাংবাদিক পরিচয়পত্রটা আমরা কেড়ে নেব। কারণ তুমি সাংবাদিক নও। তুমি শাসকের পদলেহনকারী। তুমি সাংবাদিক নও, তুমি ভাবের ঘরে চুরি করে বাংলা সাংবাদিকতাকে রাহুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ। তুমি সাংবাদিক নও, অর্থগৃধ্নু এক পাপী। তুমি বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে কলঙ্ক পেলন করছ। তুমি সাংবাদিক নও, তুমি দালাল, তুমি পাপী, তুমি নরকের কীট। যুগের পর যুগ ধরে বয়ে চলা ঐতিহ্যের শরীরে তুমি অগ্নিশলাকা গুঁজে দিয়েছে। মনে রেখো, সেই আগুনে তোমাকেই পুড়তে হবে একদিন।

সাংবাদিক বন্ধুরা, আজও যারা সততার পর্দা উড্ডীন রেখেছেন, যারা আজও সংবাদ কী তা বোঝেন, লেখেন (যদিও ছাপা হয় না), লিখতে চান, যারা মনে করেন, অন্যায়টা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাঁরা এবার ভয়ের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। জানবেন, আপনি অন্যায় করছেন না ওদের মুখোশ খুলে দিয়ে। জানবেন, আপনি পাপ করছেন না সৎ সাংবাদিকতার পাশে দাঁড়িয়ে। জানবেন গর্তে লুকোবে ওরাই যারা একদিন ধরা পড়বেই। জানবেন মানুষের মুখোমুখি ওরা হবেন না, কারণ ওদের গোটা শরীরে পাপের পাঁক। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার আসুন, মশাল হাতে পথে নামি।

পশ্চিমবঙ্গ বাঁচুক। পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা বাঁচুক। পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকরা বাঁচুক। রাহুমুক্ত হোক পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা। ■

আজকের ভারত ঐক্যবদ্ধ, নতুন ভারত

নীতীন রায়

পাকিস্তানের নামের সঙ্গে অনেক বিশেষণের সঙ্গে আরেকটি বিশেষণ যুক্ত হয়েছে State of Denial। পাকিস্তান তার নীতি বানিয়েছে সন্ত্রাসবাদে মদত দাও এবং পরে তা অস্বীকার করো। ভারতে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংবাদপত্র পাকিস্তানের এই নীতির সুযোগ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে একই দাড়িপাল্লায় মাপতে চাইছে। পাকিস্তান সন্ত্রাসের মদতদাতা। অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সরকারি মদত দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে প্রক্সিওয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ভারত তার শিকার হয়েছে। আলোচনার টেবিলে বসলেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তা জেনেশুনেও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পাকিস্তান ও ভারতকে এক করে দেখতে চাইছে। মোদী সরকারের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে পাকিস্তানকে দায়মুক্ত করতে চাইছে, মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের এই রাজনীতি ভারতকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানের মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ইজরায়েল যেভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করে ভারত সেভাবে এতদিন করতে পারেনি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইজরায়েলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাই তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে। ভারতে একশো কুড়ি কোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশে সন্ত্রাস লোকাল ম্যাটার হয়ে যায়। এতদিন সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ভরত ঐক্যবদ্ধ হয়নি। এ দুর্বলতা আজকের নয়।

ভারতে ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী হন। তার চারিত্রিক ত্রুটি এবং সমাজবাদের প্রতি মোহ ভারতের মতো আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন দেশের নেতৃত্ব দেবার অনুকূলে ছিল না। সেই সময়ে নিরাপত্তা পরিচষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৪

অভিনন্দন বর্তমান

থেকে ৫ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। আমেরিকা ১৯৫০ সালে ও রাশিয়া ১৯৫৫ সালে ভারতকে স্থায়ী সদস্য হতে অনুরোধ করে।

সমাজবাদে আস্থাবান নেহরু চীনকে এই পদের উপযুক্ত মনে করে সওয়াল শুরু করেন। পাশ্চাত্য দুনিয়া বিরক্ত হয়। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারত আমেরিকার সাহায্য চায় এবং তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি সাহায্যের হাত বাড়ান। এ ছিল নেহরুর কূটনৈতিক পরাজয় তথা ভারতের পরাজয়। শুধু পরাজয়ই নয়, ৪০ হাজার লোক প্রাণ হারায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখনও বামপন্থীরা ভারতকেই আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। কমিউনিস্ট মানসিকতা ভারতের স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করে।

১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তানকে দু'টুকরো করলো। ৩০ হাজার ভারতীয় সৈন্য আত্মাহুতি দিল। ৯০ হাজার বন্দি সৈন্য পাকিস্তানে ফেরত গেল। আমরা যুদ্ধে জিতেও আলোচনার টেবিলে হেরে গেলাম। পাকিস্তানকে বাগে পেয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হলাম না। এ ছিল নেতৃত্বের ঐতিহাসিক দুর্বলতা।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আই সি ৪১৪ বিমানটি নেপাল থেকে ১৭৮ জনযাত্রী নিয়ে দিল্লির দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে তালিবান জঙ্গি কর্তৃক অপহৃত হয়। বিমানটি আরব এমিরেটাস, দুবাই লাহোর হয়ে কান্দাহারে পৌঁছয়। পথিমধ্যে জ্বালানির জন্য অমৃতসর নামে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মিডিয়া খবর দেখাতে শুরু করে। আত্মীয়স্বজনরা দাবি তোলেন সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়ো, আমাদের লোককে মুক্ত করো। মিছিল মিটিং-সহ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহমতে মাসুদ আজহারকে ছাড়া হয়। সেদিন ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে পারেনি। ২০০৪ সালে রাশিয়ার বেনশিয়াম রাজ্যে একটি স্কুল মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা দখলে করে। ১০০০ লোককে বন্দি করে। তার অধিকাংশই শিশু। প্রায় ৩৩০ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। অন্যান্যদের উদ্ধার হয়। সেদিন রাশিয়ার জনগণ পুতিনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। পুতিন শিশুর জীবনের ওপরে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিয়েছিলেন। কান্দাহার কাণ্ডে আমরা সরকারের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনি।

কারগিল যুদ্ধের সময় বামপন্থীরা একে match fixing বলে প্রচার চালিয়েছেন। কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনার প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। বিভিন্ন

স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে সেনাদের খাবারও দেয় জনতা। পাকিস্তান সর্ববিষয়ে State of Denial ছিল। এমনকী সৈনিকদের মৃতদেহও নিতে চায়নি পাকিস্তান।

উরি ও পাঠানকোট আক্রমণের পর ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে। তাতে জঙ্গি ও পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রমাণ চাইতে শুরু করে। সেনার পরাক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলে। নেতারা এ কাজ করলেও সাধারণ মানুষ সার্জিকেল স্ট্রাইককে সমর্থন ও বিশ্বাস করেছে।

ইমরান খান ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অনেক বুদ্ধিজীবী ইমরান খানের হয়ে সওয়াল শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে লেখা হয় ইমরান খানের আলোচনা প্রস্তাব মোদী না মানলে বিরাট ভুল করবেন। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ছাপা হয় ইমরান খানকে নিয়ে। ওইসব প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় মোদীই আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করার জন্য দায়ী।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে ভারতবর্ষ নতুন চেহারা নেয় যা ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই এক বাক্যে বলেন, পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দাও। মানুষ পাকিস্তানকে যে কোনো শাস্তি দিতে আগ্রহী। ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিমানবাহিনী পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী সেখানে পুলওয়ামা হামলার উৎসব ও পরবর্তী আক্রমণের প্রশিক্ষণ চলছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বালাকোটে মিসাইলের সাহায্যে আক্রমণ চালানো হয়। এটা ইজরায়েলের তৈরি মিসাইল। ১২টি 'মিরাজ ২০০০' বিমান রাত্রি ৩-২৯ মিনিটে আক্রমণ চালায়। ৫টি এয়ার বেস থেকে বিমানগুলো আকাশে ওড়ে। স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে বিমানগুলো টারগেটে আঘাত করে। এই মিসাইলের বিশেষত্ব হলো টারগেটের সমস্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ৪টি এফ-১৬ ভারতের সেনা ঘাঁটিতে আক্রমণের চেষ্টা করে। ভারতের মিগ-২১ উপরে উঠে এফ-১৬-কে তাড়া করে। ১৯৫৬ সালে মিগ-২১ তৈরি। ১৯৮৬ সালে এফ-১৬ তৈরি। ভারতের বীর সৈনিক অভিনন্দন বর্তমান ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়েন। পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ভারত পাকিস্তানের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে। একটি Swiess পত্রিকা জানায় ভারত ব্রহ্মোস্ ক্ষেপণাস্ত্র সক্রিয় করে রেখেছে। পাকিস্তানের দিকে লক্ষ্য করে এগুলোকে বসানো হয়েছে। লক্ষ্য পাকিস্তানের বিমান শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই কাগজটি আরও জানায় পাকিস্তানের সেনা প্রধান প্রথমে সৌদি আরবে যান এবং সেখানে কড়া নিন্দার সম্মুখীন হন। সৌদি আরব ভারতকে একদিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানায়। সেই রাতে বাজওয়া তুরস্কে যান কিন্তু তুরস্ক তাকে ফিরিয়ে দেয়। সারা পাকিস্তানে থরহরিকম্প লেগে যায়। বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে পত্রিকাটি আরও জানায় যে, চীনের নিকট পাকিস্তান স্যাটেলাইট তথ্য চায়। চীন সাহায্য করতে অস্বীকার করে। সারা পৃথিবী পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। নিরপত্তা পরিষদের স্থায়ী অস্থায়ী সদস্য ১৫টি মধ্যে ভিতর ১৪টি দেশ ভারতের পক্ষে দাঁড়ায়। ভারতের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় চীন ও পাকিস্তান আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ফেঁসে যায়। চীনকে সুর বদলাতে হয়। ভারতের কূটনীতিতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় পাকিস্তান ও চীন সন্ত্রাসের সমর্থক। অন্যদিকে ভারত শুধু সন্ত্রাসবাদকে খতম করতে চায়, পাকিস্তানকে নয়। ইমরান খান শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসে। ভারতের অভ্যন্তরের পাক সমর্থকরা জেগে উঠে। এই নেতাদের কথা পাক মিডিয়া হেডলাইন করে। দেশপ্রেমী ভারতীয়রা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। আপামর জনসাধারণ মোদী সরকারকে সমর্থন জানায়। এটা ঐক্যবদ্ধ ভারতের লক্ষণ। নয়া ভারত অতীতের দুর্বলতা কাটিয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে বিশ্বের দরবারে হাজির।

ওয়ার্ল্ডস্ট্রিট জার্নাল ভারতের কূটনৈতিক জয়কে উল্লেখ করে আগামীদিনে ভারত শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করে। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস পুলওয়ামা আক্রমণকে দুর্ঘটনা প্রসূত বিস্ফোরণ বলে অভিহিত করে। ওই প্রবন্ধে একবারের জন্য একে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলেনি। কারণ পরদিনের নিরপত্তা পরিষদের বৈঠককে প্রভাবিত করা নিউইয়র্ক টাইমসের উদ্দেশ্য ছিল। ১৪টি দেশ মাসুদ আজহারকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণার পক্ষে মত দেয়। চীন ও পাকিস্তানকে কূটনৈতিক জালে ফাঁসিয়ে নয়া ভারত শত্রুকে আনত করতে চায়।

ভারত ১২০ কোটি মানুষের দেশ। ঐক্যবদ্ধ ভারতের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারলে না এটা প্রমাণিত সত্য। যেভাবে ক্রোধের অগ্নি জনমনে বিস্তারলাভ করেছে তাকে কেউ অবহেলা করতে পারবে না। ▮

স্বস্তিকার বাংলা নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

স্থান—শোভাবাজার নাটমন্দির

৬৭সি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, শোভাবাজার, হাতিবাগান

কলকাতা—৭০০০০৫

দিনাঙ্ক : ১৩ এপ্রিল ২০১৯ (বাংলা ২৯শে চৈত্র, শনিবার)

সময় : বিকেল ৫টা।

।। সবার আমন্ত্রণ রইল।।

বিরোধীরা চোখ মেলেও শুধু অন্ধকার দেখছেন

তরুণ বিজয়

যে সংগঠনের সঙ্গে ধর্মশক্তি, আদর্শশক্তি ও মহাপুরুষদের তপোশক্তি রয়েছে তাকে কে হারাতে পরে? বিশ্ব সংসারে সম্ভবত এরকম উদাহরণ কমই দেখা যাবে যে ৯০ বছর আগে শুরু হওয়া এক ভাবনাত্মক আন্দোলন তাদের দু-দুজন কার্যকর্তাকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর গদি পর্যন্তই পৌঁছে দেয়নি, উপরন্তু দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাথেয়ও নির্মাণ করেছে। এরকম একটি শক্তিকে নষ্ট করার একটাই উপায়, যদি সে স্বয়ং অহংকার ও জাতিবিদ্বেষের শিকার হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, অন্যথায় পৃথিবীর কোনো শক্তি এই আদর্শশক্তিকে এগিয়ে যেতে ও বিজয়ী হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী যুদ্ধ শুধু দুজন ব্যক্তির মধ্যে নয় বা এক দল বনাম অন্য দলের নয়। এই যুদ্ধ নিশ্চিত করবে যে, ভারত ভারত থাকবে না থাকবে না। যখন পাঞ্চজন্য ও অর্গানাইজার পত্রিকার সম্পাদক তথা 'রগ রগ হিন্দু মেরা পরিচয়' কবিতা লেখা কানপুর থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া যুবক প্রচারককে জনসঙ্ঘে পাঠানো হয়েছিল, তখনও অন্ধকার গভীর ছিল, চ্যালেঞ্জ খুব তীব্র ছিল, কষ্ট ও সংঘর্ষ অধিকমাত্রায় ছিল। সেজন্য কাজ করার মজাও আলাদা ছিল। তখন পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে সংগঠনের কাজ করতে হতো। কিন্তু দায়বদ্ধতা ছিল, জিদ ছিল। সবাইকে নিজের মনে হতো। অপরিচিতকেও আপন করে নেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। টাকাপয়সার আবশ্যকতা খুব একটা মনে হতো না। 'সওয়া লাখ সে এক লড়াউঁ' ভাব মনে সবসময় খেলা করত। ঐশ্বর্যের দ্বারা আদর্শ বৃদ্ধি পায় একথা কেউ কোনোদিন মনে করেনি। কিন্তু শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ তো প্রয়োজনই। আজ ধর্মবল, আদর্শবল ও তপস্যাবলের ওপর প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ স্বীকার করতে হচ্ছে।

কিন্তু আমরা তো ঘরপোড়া গোরু। কোথাও যা কিছু হোক, হার বা জিৎ– আমরা হিন্দুদের কান্না এবং হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়াই দেখতে পাচ্ছি। আসন যত খুশি আসুক, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাওয়া এবং বিদেশি ধন ও ধর্মান্তরণের বিস্তার তো কমেনি। কাশ্মীরে হিন্দুরা ফিরে যেতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দিরের ওপর বিধর্মীদের কবজা জারি রয়েছে। ভোটে শুধু জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কোন জাতির আর তোমার কাছে কত টাকা আছে? কিন্তু এই লড়াই তো তাঁদের নয় যারা দেশে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রকৃতি বহু অহংকারের ফয়সালা করবে। এই লড়াই তাঁদের যাঁরা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতকে বাঁচাতে চান। বিরোধীরা নিয়মশৃঙ্খলাহীন। তারা পরাজয়ের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে। তারা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে এখন ক্ষমার অযোগ্য। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। নির্মম হতেই হবে। নিজের মান-অভিমান সবকিছু ভুলে গিয়ে এখন একটা কথাই মনে রাখতে হবে যে, এবার কোনো ভাবে যেন সরদার প্যাটেলের স্থানে নেহরুর চয়ন না হয়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্থানে যেন বিদেশির ডোরে বাঁধা কাঠপুতুল না এসে পড়ে। ঈর্ষা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং পছন্দ- অপছন্দের টানাপোড়েনে পানিপথের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।

সব কিছু ঠিক চলছে। কিছু কম-বেশি আগামীবার সম্পন্ন করা যাবে। বিরোধীরা পিছনে হঠছে কিন্তু দেশ এগিয়ে চলছে। গরিব মহিলারা পেয়েছেন উজ্জ্বলা যোজনায় রান্নার গ্যাস ও আলো। তারফলে তাঁদের উনুনের ধোঁয়া ও রাতের অন্ধকার দূর হয়েছে। কিন্তু কিছু লোকের আলো পছন্দ নয়, তারা অন্ধাকারেই খুশি থাকেন। এরকম শুধু নোংরা ঘাঁটা লোকেদের গান্ধীজী বলেছেন– 'গাটার ইন্সপেক্টর'। তাদের কাজই নোংরা খুঁজে বেড়ানো। বাগানে বসন্ত এসেছে, ফুল ফুটেছে, সুগন্ধ বইছে, কিন্তু গাটার ইন্সপেক্টর শুধুই নোংরা খুঁজে বেড়ায়– পচা ও দুর্গন্ধ নোংরা।

একটি গল্প বলছি। এক সজ্জন ছিলেন। তিনি শুভ কাজে, উৎসব-অনুষ্ঠানে অশুভ ও অমঙ্গলের কথা বলতেন। তার ব্যবহারে লোক বিরক্ত হয়ে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন। নতুন এসেছেন, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে জানতো না। এক ব্যক্তি তাঁর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তাঁকে ডেকেছেন। সেই সজ্জন খুব খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে গৃহস্বামীকে বললেন, আপনি তে দারুণ বাড়ি বানিয়েছেন। গৃহস্বামী বললেন, এই আর কী। সেই সজ্জন বললেন, কিন্তু দরজাটি খুব ছোটো করেছেন। গৃহস্বামী বললেন, পাহাড়ে দরজা এরকম ছোটোই হয়। সজ্জন বললেন,না, মানে কাল যদি আপনার বাড়ির কেউ মারা যায় তখন প্রার্থনাকারীদের বের হতে কষ্ট হবে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের বিরোধীরা এরকম। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছেন না। সুখী কৃষক-মজুর-গৃহিণীদের এরা দেখছেন না। কৃষকদের দু' শতাংশের মতো নগণ্য সুদ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এক লক্ষ টাকা ঋণের কথা বলা হচ্ছে না। বিশ্বে সবাই রক্ষক অর্থাৎ চৌকিদারের অভাব অনুভব করে। কিন্তু এখানে বিরোধীরা বলে চৌকিদার চাই না। চৌকিদারের প্রয়োজনই নেই। দরজা খুলে রাখো, চৌকিদার হঠিয়ে দাও— যাতে আমাদের একটু সুবিধা হয়। খুব মুশকিল হয়েছে বিরোধীদের। যখন থেকে মোদী এসেছেন তাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দরজায় লাঠি হতে চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছেন— বার বার 'হুঁশিয়ার' বলছেন।

হুঁশিয়ার থাকো, চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছেন— চোরেদের খুব দুর্দশা। তারা বলছে চৌকিদারের কী প্রয়োজন? তাদের মনে হচ্ছে চৌকিদার কোনো মাফিয়া। এই মাফিয়া শব্দ কোন দেশ থেকে এসেছে আপনারা জানেন। গড ফাদার ফিল্ম আপনারা দেখে থাকবেন— সেও চৌকিদারের বিরুদ্ধে ছিল, আমাদের বিরোধীরাও চৌকিদারের বিরুদ্ধে।

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের নয়া সংকট

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের নয়া সংকট, না সংকটে পশ্চিমবঙ্গ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা দেখলাম রাজ্যের ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিযোগিতায় তৃণমূল কংগ্রেস জিতে গেল। বিরোধীরা আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত কোনো সন্তোষজনক বিধান দিতে পারলেন না। শাসকদল এতেই দম পেয়ে গেল। বাকি ১০ শতাংশ বিরোধীদের জেতা প্রার্থীদের জানে মেরে দেওয়ার হুমকি দিয়ে দলে টেনে নিল নতুবা গ্রাম ছাড়া করে দিল এবং ছলেবলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে বোর্ড হাতিয়ে নিল। ইদানীংকালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিমবঙ্গের মতো এত রক্তপাত এবং হতাহতের নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। বছর ঘুরতেই লোকসভা ভোট এসে গেল। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোষণা করল—'এ রাজ্যে কেন্দ্রবাহিনী দিয়ে ভোট করা হবে।' বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রের এই প্রস্তাবে সায় দিল ভোট যাতে নির্বিঘ্নে করা যায়।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যা ঘটে গেল তা নিছক এক তাৎক্ষণিক ঘটনা এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক দুর্যোগ একথা মেনে নেওয়া যায় না। একে রাজনৈতিক হটকারিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। সবটাই পরিকল্পনা মাফিক ঘটানো হয়েছে। বিরোধী শূন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার লক্ষ্যে এবং সামনের লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে। গত পঞ্চায়েত ভোটে এত সংঘর্ষ এবং রক্তপাত ঘটেছে তা নজিরবিহীন। এখন লোকসভার ভোট কতটা নির্বঘ্নে শেষ হবে সময় তা বলবে। পঞ্চায়েত ভোটের তিক্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের সব কেন্দ্রকে অতি স্পর্শকাতর ঘোষণা করা হোক— এই দাবি নিয়ে যখন নির্বাচন কমিশনারের নিকট হাজির হলেন তখন এই রাজ্যের শাসকদলের নেত্রী একটা সাংবাদিক বৈঠকে বলে বসলেন— 'বাংলার সব কেন্দ্রকে অতি স্পর্শকাতর বলে প্রকৃতপক্ষে বাংলার জনগণকে অপমান করেছে।' ভাবুন, জনগণকে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার যিনি এক প্রকার কেড়ে নিয়েছেন তিনি কোন মুখে নিজের সাফাই নিজেই গাইছেন। দলের মহিলামোর্চার সদস্যদের নির্দেশ দিলেন রানি রাসমণি রোডে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা অবধি ধরনায় বসতে। সেই কথামতো কাজ শুরু হয়ে গেল। এদিকে রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা 'এসএসসি'র পরীক্ষায় প্যানেলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্যানেল বহির্ভূত প্রার্থীদের চাকুরি দেওয়ার প্রতিবাদে আমরণ অনশন করছে সেদিকে 'মা-মাটি-মানুষের' নেত্রীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এর নামই কি গণতন্ত্র? সংসদীয় পরিকাঠামোয় রাজ্যকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া আছে বলেই অপরের নৈতিক অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। রক্ষা করার দায়বদ্ধতা কীভাবে অস্বীকার করা যায়? একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তার ব্যর্থতা ঢাকতে নানারকম অপকৌশল অবলম্বন করে চলবে এবং গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরবে সেটা কখনও চিরকাল চলতে পারে না। গত ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের দুঃশাসনের ইতিহাস সেই কথাই বলে। কী আশ্চর্য যাঁর হাতেই দুঃশাসনের সমাপন ঘটেছিল আর আজ সেই তিনি দুঃশাসন কায়েম করার লক্ষ্যে অবিচল থেকে যদি ভেবে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ তাঁর খেয়ালে চলবে তাহলে তিনি মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। দেওয়াল লিখন বড়ো নির্মম। পৃথিবীর সব স্বৈরাচারী শাসককুল তা পড়তে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের রাজ্যের জননেত্রী সেই ভুলটাই করে চলেছেন। একদিন তিনিও শেষ হয়ে যাবেন।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

রাজ্যে চলছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস

দেশ বিরোধী সন্ত্রাসে খুন হলো দেশের ৪০ জন জওয়ান। দেশ শোকাহত। জঙ্গি নিধন হোক। ভারতীয় বায়ুসেনার ভোররাতে

জঙ্গিঘাঁটিতে আক্রমণকে দেশবাসী দারুণ ভাবে সমর্থন করে। কিন্তু ওদের মাথাকে নিধন করতে হবে। লাদেনের মতো। আমাদের রাজ্যে চলছে রাজনীতির সন্ত্রাস। এর হোতা তৃণমূল কংগ্রেস। মৌলবাদী সন্ত্রাস যেমন অন্যায় তেমন অপরাধ। রাজনীতির সন্ত্রাস— আমি একাই থাকব আর সব বাদ, এটা হতে পারে না।

মানুষ ভোট দেবে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে। স্বাধীনভাবে মানুষ তার মতামত দেবে। সংগঠন নিশ্চয় ভোট করাবে না; মানুষ নিজের ভোট নিজে দেবে। সদ্য ঘটে যাওয়া পাঁচ রাজ্যে তেমন নির্বাচন আমরা দেখলাম। কোনো হিংসা হয়নি। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে— তৃণমূল সুপ্রিমোর হিংসা ছড়ানো কথা— ৪২ শে ৪২ চাই। মানুষ ভোট দেবে। ফলাফল তখন জানা যাবে। আগে ভাগে ফল বলা স্বৈরাচারী ঝোঁক।

সব টিএমসি এখন বিজেপি হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতেও হচ্ছে। দল ভাঙিয়ে বিজেপি হলে, কর্মটাও ভালো হবে না। অর্থাৎ ফল একই, শুধু লেবেল চেঞ্জ। সমাজ বিরোধীর আখড়া এখন তৃণমূল।

—**শোভন মিত্র,**
হাওড়া।

ভোটের রঙ্গ

এবারের লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থীরূপে তৃণমূলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। লোকসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণের জাতীয় গড় যেখানে ৬৭.০১ সেখানে তৃণমূলের এই ননপারফরমিং অ্যাসেটদের পারফরমেন্স হলো ২, ১, ৪, ৩, ৮। ঠিক একই ভাবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে জাতীয় গড় যেখানে ২৯২, সেখানে মমতা দেবীর এই ননপারফরমিং অ্যাসেটদের প্রশ্ন করার পারফরমেন্স গ্রাফ

হলো ৩, ০, ২, ০,৭।

আসন্ন লোকসভায় ননপারফরমিং অ্যাসেটদের নতুন সংযোজন হলেন আরও দু'জন। ভোটের প্রচারে গ্ল্যামারকে ব্যবহার করে এরা পাবলিকের তালি কুড়োবেন। কেউ কেউ বা ভোটেও জিতবেন, রূপচর্চা করে সংসদেও যাবেন। রাজ্যের স্বার্থের বিষয়ে সংসদে মুখ খুলবেন না। এরা অভিনয় করতে পারলেও সংসদে কথা বলতে পারেন না।

অথচ এই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন হিরেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয় দাসমুন্সী, বাসুদেব আচারিয়ার মতো সাংসদরা। যাঁদের বাগ্মিতায় বিহ্বল হতো বা আজও হয় সারা ভারতবর্ষ। আজ সেই সংসদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুধুই যাত্রাপালার সং সাজিয়ে পাঠানোর চেষ্টা করছেন তৃণমূলনেত্রী। লিপস্টিক আর পারফিউমে ম-ম করে এরা লোকসভায় সত্যই সঙ সেজে বসে থাকেন। মনে রাখা দরকার, দেশ এই সাংসদদের জন্য মাসে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করে।

—**সুমন সরকার,**
ধুলাগড়ী, হাওড়া।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের জনমত

নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে যখন আসীন হন তখন স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কুশীলব এবং পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দেশটা গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে মোদীজীর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে এবং রাষ্ট্র ও জনহিতকর কার্যকলাপে ভারতবর্ষ যখন এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে রূপান্তরিত হতে চলেছে তখন বিরোধীরা নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বাঁচতে 'মোদী হঠাও' রব তুলে জোট বেঁধেছে।

আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতা করে পশ্চিমবঙ্গকে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে নমিনেশন ফাইল করতে দিচ্ছে না। পকেট ভারি করতে চিটফান্ডের টাকা লুট করছে আর নির্বাচনে খরচের দোহাই দিচ্ছে। কলেজে ছাত্রভর্তিতে তোলা আদায় করছে, ছাত্র আন্দোলনের নেতা, নির্বাচনে বিজয়ী বিরোধী দলের প্রার্থীকে খুন করে গাছে লটকে দিচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধে অন্য রাজ্যে যখন একের পর এক মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে তখন বেশি রাজস্ব আদায়ের লোভে এবং ভোটে ফয়দা লোটার আশায় যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ত করতে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে রাজ্যবাসী কখনই এ মেনে নেবে না। যে হিন্দিভাষীদের এ রাজ্যের মেহমান বলা হয়েছিল ভোটের স্বার্থে তাদের জন্য পৃথক সেল, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা তো ভণ্ডামিরই নামান্তর। অর্থনৈতিক অপরাধ দমনে 'নোটবন্দি' এবং স্বচ্ছ ব্যবসায়ের স্বার্থে 'জিএসটি'র বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে পরিত্রাণ পেতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র পরিকল্পনা 'মোদী হঠাও' জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আগামী লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না তখন মহাজোটের নেতাদের মধ্যে শুরু হবে প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াই যার ফলশ্রুতি 'হাং পার্লামেন্ট, হর্স ট্রেডিং, অনিশ্চয়তা, এবং সীমাহীন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং জনগণের চরম দুর্গতি যা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাম্য নয়। তাই পরিবারতান্ত্রিক আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত কংগ্রেস, বিশ্বাসঘাতক ও খুনি সিপিএম এবং ক্ষমতালোভী ও দেশদ্রোহী তৃণমূলিদের 'মোদী হঠাও' এর পরিকল্পনা মুর্খতারই নামান্তর। কারণ ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর সমকক্ষ জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষে তো নেইই, সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তাই এই বিরোধী দলের চমকের রাজনীতি, তর্জন-গর্জন, আস্ফালন, লাগামহীন উদ্ধত্য সীমাহীন সংখ্যালঘু তোষণ, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠকতা এবং অপরাধীদের আড়াল করতে পুলিশ প্রশাসনকে দলদাস করা রাজ্যবাসী কখনই মেনে নেবে না। আর সন্ত্রাসের আবহে দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে গিয়েছে তখন সুশাসনের পক্ষে ভোট দিতে রাজ্যবাসী এখন বদ্ধপরিকর। অত্যাচারের ভয়ে তৃণমূলিদের পক্ষে থাকার কথা বললেও নির্বাচনে ত্রিপুরার মতো ফলাফলের সম্ভাবনা খুব বেশি।

সর্বোপরি, পুলওয়ামা ঘটনার পর পাকিস্তান যখন ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তখনও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এয়ার স্ট্রাইকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের পক্ষে সওয়াল দেশবাসী কখনই মেনে নেবে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এহেন আচরণ এদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। বিষাক্ত সর্পরূপধারী এই দলগুলির মাথা গুড়িয়ে দিতে দেশপ্রেমী ভারতবাসী এখন তৎপর।

—**ডাঃ মদনলাল চৌধুরী,**
নলহাটি, বীরভূম।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

অভিজ্ঞা দেবী

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নীপময়ী দেবীর তৃতীয়া কন্যা অভিজ্ঞাদেবীর জন্ম হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি। অভিজ্ঞাদেবী অনিন্দ্যসুন্দর সংগীতকণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাগায়ক রাধিকামোহন গোস্বামীর কাছে গান শেখেন। তাঁর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর একটি লেখায় : 'দেহ বলে তার কোনো জিনিস ছিল না। মুখের মধ্যে দুটি বড়ো বড়ো জীবন্ত চোখ ছিল। আর সে চোখদুটি মাধুর্যপূর্ণ।'

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়। ন' বছরের অভিজ্ঞাদেবী অন্ধমুনির কন্যা লীলার ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'ভারতবন্ধু' পত্রিকায় লেখা হয় ''মুনিকুমার জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকটে যেরূপে গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।''

বিভিন্ন নাটকে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। বেথুন স্কুলের প্রাঙ্গণে সখিসমিতির উদ্যোগ অনুষ্ঠিত মহিলা শিল্পমেলার প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়। গীতিনাট্যটিতে অভিজ্ঞাদেবী প্রমদার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর বড়লাটপত্নী লেডি ল্যান্সডাউনের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আগমন উপলক্ষ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। অভিজ্ঞা হাতবাঁধা বালিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আনুমানিক ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিজ্ঞার পরিণয় ঘটে। চিররুগ্ন ছিলেন, বিবাহরাত্রে রোগ ধরা পড়ে। ড. চিত্রা দেব লিখেছেন : ''অভিজ্ঞা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, রোদনভরা বিষণ্ণ। কালব্যাধি যে তলে তলে বাসা বেঁধেছে সে কথা কেউ বুঝতে পারেনি। বিয়ের রাতে ঘটলো অঘটন। অনুষ্ঠানের শেষেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ জ্বর, প্রবল জ্বর। দিনে দিনে অসুখ বেড়ে চলে এবং জানা যায় দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। চিকিৎসার অসাধ্য, কৃশ পাণ্ডুর চাঁদের মতোই একমাসের মধ্যে হারিয়ে গেলেন অভিজ্ঞা।''

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ভালোবাসতেন তাঁর গানও। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নলিনী তালুকদারকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল। তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল। অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। সে আজ অনেকদিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি সোনার তরীতে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলাম।'

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল অনুমান করেছেন, 'অভিজ্ঞা হয়তো ইংরেজি অনুবাদে পড়া রূপকথার গল্প পিতৃব্যকে শুনিয়েছিলেন, সেই স্মৃতিই 'বিম্ববতী কবিতার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।'

অভিজ্ঞাদেবীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভৌতিক সভা'র আলোচনায় 'অপূর্ব রামায়ণ' লেখেন, ''বাড়িতে একটা শুভকার্য ছিল। তাই বিকেলের দিকে অদূরবর্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবত বাজিতেছিল। ব্যোম অনেকক্ষণ মুদ্রিতচক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমাদের এই সকল দেশিয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলই অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নতুন নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য, কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভালো লাগিতেছে কেন? কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে— মনে হইতেছে, মৃত্যুটা এই রাগিণীর মতো সকরুণ বটে, কিন্তু এই রাগিণীর মতোই সুন্দর।''

সম্ভবত অভিজ্ঞাদেবীর পরিণয়ের রাত্রেই তাঁর জ্বর এবং পরে তাঁর কালব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ এই রচনাটির প্রেরণা। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গান ভালোবাসতেন। 'মায়ার খেলা'-য় তাঁর গান সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর লিখেছেন : ''হায়, যে ওসব গান গাইবে সে মরে গেছে, সেই পাখির মতো আমাদের ছোটো বোনটি চলে গেছে। এখনো 'মায়ার খেলা'র গান যদি কাউকে গাইতে শুনি, তার গলা ছাপিয়ে কতদূর থেকে আমাদের সেই বোনটির গান যেন শুনি। ...সে সুরে যে গাইত সে পাখি মরে গেছে। কে গাইবে। অভির গলায় ওই সুর যা বসেছিল, তার গলার 'টিম্বার' অদ্ভুত ছিল।'' ■

মেথি তিতা হলেও মহা গুণকারক

অসিতবরণ আইচ

● তিক্ত স্বাদের এই বস্তুটি মানুশের জীবনকে সুমিষ্ট করে তোলে ব্যবহার গুণে।

● রান্না ঘরের এক মহা উপকারী জিনিস এই মেথি। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। পুরনো হলেও নষ্ট হয় না।

● মেথি ভেজে খেলে সব গুণ নষ্ট হয়।

● জলে ভিজিয়ে বা গুঁড়ো করে খাওয়া যেতে পারে।

● মেথি ফোটানো জল চায়ের মতো করে খাওয়া যেতে পারে।

● গর্ভবতী নারী ও শিশুদের মেথি না খাওয়াই ভালো।

● বসন্তরোগে মেথি ভেজানো জল খুবই উপকারী। কারণ গুটিগুলি সব বেরিয়ে রোগের জ্বালা যন্ত্রণা কমায়।

● বহুমূত্র রোগে মেথি ভেজানো জল বা মেথি চিবিয়ে খেলেও অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়।

● এক চা-চামচ মেথি চিবিয়ে খেলে ওজন কমে।

● মেথির জল স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমায়। এক গেলাস জলে এক চা-চামচ মেথি ভিজিয়ে সেই জল পরেরদিন সকাল-বিকেল খেতে হবে।

● ওই ভাবে খেলে কোলেস্টেরল কমায়।

● মেথি হার্ট ভালো রাখে।

● মেথি ভেজানো জলে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশি কমে।

● মেথি ভেজানো জল বা মেথির গুঁড়ো জলে মিশিয়ে খালি পেটে খেলে কৃমি কমে।

● মেথি ভেজানো হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও ক্ষুধা বাড়ে।

● মেথি ভেজানো জলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং গ্যাস-অম্বল কমে। পেটের জ্বালা কমায়।

● নিয়মিত মেথি ব্যবহারে ক্যানসার ও টিবি প্রতিরোধ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

● গরম জলের সঙ্গে মেথি চূর্ণ খেলে হাঁটুর ব্যথা সহ গাঁটের ব্যথা দূর হয়।

● মেথি চূর্ণ গরম জলে গুলে খেলে মায়েদের স্তনে দুধ বৃদ্ধি পায়।

● গরম জলে মেথি ফুটিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে দিনে কয়েকবার খেলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

● নিয়মিত মেথি ভেজানো জল খেলে কিডনির পাথর গলে যায় এবং কিডনি ভালো রাখে।

● মেথি বাত ও কফ নাশক কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করে।

● মেথির গুঁড়ো দুধ দিয়ে নাড়ু বানিয়ে খেলে সর্দি-কাশিতে লাভদায়ক।

● এক চামচ মেথি এক কাপ নারকেল তেলে গরম করে সেই তেল ঠাণ্ডা করে নিয়মিত মাথায় মাখলে চুলপড়া কমে এবং চুল ভালো হয়।

● শরীরে ঘা ও ফোড়া হলে মেথি ব্যথা ও জ্বালা কমায়।

● সুতিকা রোগে মেথি ভেজানো জল কেলে অত্যন্ত উপকার হয় প্রসুতির।

● মেয়েদের ঋতুর অনিয়মে মেথি ও ধনে ৩/৪ গ্রাম করে একসঙ্গে এক গেলাস জলে রাত্রে ভিজিয়ে পরের দিন সকাল-বিকেল কেলে উপকার পাওয়া যাবে। ■

দেশজুড়ে বিজেপি ঝড়, আগ্রহ বাড়ছে সব মহলে

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার উৎসাহ। যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও সাধারণ কর্মী, পাশাপাশি রয়েছেন বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত মানুষও। প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এই উৎসাহ কীসের ইঙ্গিত দেয়? উত্তরটা খুব সহজ। দেশের মানুষ চাইছেন নির্বাচনে জিতে এনডিএ সরকার গঠন করুক। নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হোন। নরেন্দ্র মোদীর কাজে ও দক্ষতায় মানুষ আকৃষ্ট।

জয় পণ্ডা

ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজু জনতা দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে দলবিরোধী

কাজকর্মের জন্য দল তাকে সাসপেন্ড করা হয়। যদিও তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। অন্যদিকে, দলের নেতৃবৃন্দের একাংশ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই অভিযোগ করলেও দল তার কোনও তদন্ত করেনি। ফলে তিনি দলত্যাগ করেন। বিজেপিতে যোগ ৪ মার্চ ২০১৯। ২০০০ থেকে ২০০৯ তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত অভিনেত্রী। বাংলা এবং

হিন্দি দুই ভাষার ছবিতেই অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ বালিকা বধূ ছবিতে। পরিচালক ছিলেন তরুণ মজুমদার। রাজনীতিতে যোগ ২০০৪ সালে। সেবার তিনি কংগ্রেসের হয়ে কলকাতা (উত্তর-পূর্ব) কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের অজিত পাঁজার কাছে হেরে যান। বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ২ জানুয়ারি ২০১৯।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ও হিন্দি ছবির বিখ্যাত অভিনেতা। মায়ামৃগ, দুই ভাই, বিশ সাল বাদ ইত্যাদি ছবিতে বিশ্বজিতের অভিনয় এখনও প্রবীণদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

ছবিতে অভিনয় করা ছাড়াও ভালো গান করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০১৪ সালে দক্ষিণ দিল্লি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে হেরে যান। সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

গৌতম গম্ভীর

বিখ্যাত ক্রিকেটার। ক্রিকেটের তিনটি ফরম্যাটেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০০২ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে পরপর দুটো শতরান করে নজরে

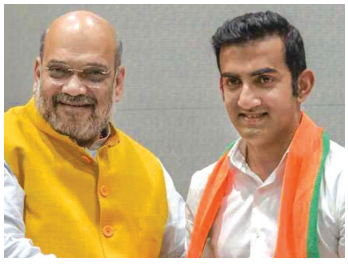

পড়েন। ২০০৯ সালে তিনি আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। ভারতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দাও করেন। রাজনীতিতে ইনিংস শুরু করলেন বিজেপিতে যোগ দিয়ে।

জয়াপ্রদা

তেলুগু এবং হিন্দি ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে

দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি তেলুগু দেশম দলে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। পার্টির সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে দল ছাড়েন এবং সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন। ২৬ মার্চ ২০১৯ জয়াপ্রদা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ঝড় আসছে, ঘুম নেই সুখের পায়রাদের

চন্দ্রভানু ঘোষাল

মালদার সভায় রাহুল গান্ধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছিলেন। মমতা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, রাহুল তো বাচ্চা ছেলে। যদি কিছু বলতে চায় বলতে দিন। মমতার কথা শুনে যারা তাঁর ভক্ত তাঁরাও নিশ্চয়ই হেসেছেন। কারণ মমতার সমালোচনা করলে রাহুল যদি বাচ্চা ছেলে হয়ে যান এবং তাঁর কথাকে যদি ধর্তব্যের মধ্যে ধরা না হয় তাহলে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করার সময়েও রাহুলকে বাচ্চা ছেলে হিসেবেই দেখা উচিত। এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমালোচনা, নিন্দা, গালিগালাজ— সর্বোপরি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচিত।

কিন্তু এরকম হয় না। সাধারণত বিরোধী নেতৃকুল এবং মিডিয়া দু'রকম কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে। অন্য নেতাদের সমালোচনা করলে রাহুল বাচ্চা ছেলে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করলে তিনি বিচক্ষণ, পরিণত— এমনকী বিজেপির নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত রাজনীতিবিদ। বস্তুত এতদিন রাহুলের আচরণেই এই বালখিল্যপনা দেখা গেছে। কিন্তু নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে এবং নির্বাচনে আরও একবার মোদী-ঝড় ওঠার সম্ভাবনা যত বিকশিত হচ্ছে ততই এই ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে অন্য নেতা এবং দলের মধ্যেও। উদাহরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম এবং রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস।

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দল ক্ষমতায় এলে দু'শো দিনের কাজ নিশ্চিত করবে। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজই মানুষ ঠিকমতো পায় না। যে কাজ সাধারণ গরিব মানুষের জন্য, সেই কাজ বিতরণের ক্ষেত্রেও দলবাজির অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে তার দল। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, তৃণমূলের ছাপ থাকলে কাজ পেতে সুবিধে হয়, না থাকলে হয় না। এরপরও মমতা একশো দিনের জায়গায় দু'শো দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে চান। অর্থাৎ তার প্রশাসনিক ব্যর্থতার জাতীয়করণ করতে চান। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একে বালখিল্যপনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি। ভারতের মেইনস্ট্রিম রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই মিথ্যে-নির্ভর। প্রতারণা-নির্ভর। কিন্তু যে-মিথ্যে সহজে ধরা পড়ে যায় তার ওপর ভর করে কোনও রাজনৈতিক লাভ সম্ভব নয়।

সিপিএম তাদের ইস্তাহারে কৃষকদের বছরে ১৮,০০০ টাকা করে দেবার কথা ঘোষণা করেছে। ভালো কথা, দেওয়াই উচিত। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, ৩৪ বছর সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিল, তখন দেয়নি কেন? পশ্চিমবঙ্গে কি কৃষক ছিল না? বর্গা আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেইসব কৃষক পার্টির সৌজন্যে জমির মালিক হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন এরা ছিলেন সিপিএমের বিশ্বস্ত ভোটব্যাঙ্ক। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের কৃষকের স্বার্থবিরোধী আচরণেরও সাক্ষী। পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের মূল কারিগর ছিল সিপিএম। টাটা গোষ্ঠী যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল তার একটা বড়ো অংশ পার্টির ক্যাডাররা নয়ছয় করে। এই ঐতিহাসিক প্রতারণার উচিত শিক্ষা তারা পেয়েছে। তাই নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া দলকে অক্সিজেন জোগাতে আবার তারা কৃষকদের টার্গেট করেছে।

রাহুল গান্ধী নির্বাচনের আগে স্লোগান তুলেছেন, গরিবি হটাও। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমতায় ফিরলে দেশের দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে মাসে ৬,০০০ টাকা করে ভাতা দেবেন। রাহুলকে এমন একটি উন্মাদের পাঠক্রম রচনা করার বুদ্ধি নাকি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদেরা দিয়েছেন। যাদের মধ্যে অন্যতম আরবিআইয়ের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। রঘুরাম রাজনের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ এতদিন হয়নি, রাহুল গান্ধীর সৌজন্যে সেই প্রশ্ন এবার উঠবে। কারণ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ দরিদ্রতম পরিবারকে বছরে ৭২,০০০ টাকা করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এটা কোনও এককালীন ভাতা নয়, প্রত্যেক বছর দেওয়া হবে। এত টাকা কোথা থেকে আসবে রঘুরাম রাজন বা রাহুল গান্ধী কেউই কিছু বলেননি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য যদি প্রত্যেক বছর এত টাকা ব্যয় করতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সামাজিক ন্যায়ের বহু প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হবে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন দরিদ্র মানুষই। অর্থাৎ রাহুল মানুষকে প্রতারিত করতে চাইছেন। যেভাবে তাঁর পূর্বসুরিরা এদেশের মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় বানিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে মানুষকে বোকা বানিয়ে পেরোতে চাইছেন নির্বাচনের বৈতরণী।

রাহুলের বালখিল্যপনার আর একটি নিদর্শন তাঁর স্লোগান, গরিবি হটাও। এই একই স্লোগান তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছিলেন আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে। কিন্তু তখন এই স্লোগানের একটা অর্থ ছিল। সেই সময় ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক, চীনের কৃষক বিপ্লব ইত্যাদি কারণে ভারতে মার্কসবাদ একটু একটু করে মাথা তুলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলছে নকশাল আন্দোলন। সেই দিনবদলের তরঙ্গে গা ভাসিয়েছিলেন ইন্দিরা। মার্কসবাদীদের দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত সমাজগঠনের অনুষঙ্গে তৈরি হয়েছিল স্লোগান, গরিবি হটাও। কিন্তু রাহুল গান্ধী এমন সময়ে ঠাকুমাকে স্মরণ করলেন যখন ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। এই ভারতবর্ষ তার ঠাকুমার আমলের দুর্বল, পরমুখাপেক্ষী পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষ নয়। এখন ভারতের গরিব মানুষেরও নিজস্ব ব্যাঙ্ক আকাউন্ট আছে, ৬ কোটি গরিব মহিলার রান্নাঘরে রয়েছে রান্নার গ্যাসের সংযোগ, এই ভারতের গরিব রিকশাওয়ালার হাতেও স্মার্টফোন দেখতে পাওয়া যায়।

কলকাতার যেসব বস্তিতে দরিদ্র মানুষ বসবাস করেন সেখানকার টালির চালে উঁকি দেয় ডিশ অ্যান্টেনা, সোলার প্যানেল। এই নতুন

ভারতের মেয়েরা হীনমন্যতায় ভোগে না। উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামেও মেয়েদের নাম নেমপ্লেটে দেখা যায়। ভারতের গরিব মানুষ এখন পরিবেশ সচেতন। আগেকার মতো খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করতে রাজি নন। তারা শৌচাগার চান। এই নতুন ভারতে গরিবি হটাওয়ের মতো স্লোগান পাগলের প্রলাপ মাত্র।

কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন ওঠে। ভারতের তামাম বিরোধীকুলের এমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে ওঠার কারণ কী? কারণ, একমেবাদ্বিতীয়ম্ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাঁর পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। দেশের উন্নতির জন্য যা যা করা প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদী ঠিক তাই করেছেন। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে প্রবল রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে বিমুদ্রীকরণের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের ভিতু-ভিতু ইমেজ মুছে দিয়ে দেশকে সাহস এবং পরাক্রমের শীর্ষে স্থাপন করেছেন। এখন পৃথিবীর যে কোনও দেশ ভারতকে সমীহ করে। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের পর ভারতকে সারা বিশ্বের সমর্থন। নেহরু থেকে ইন্দিরা, রাজীব থেকে মনমোহন— কেউই এমন সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেননি। তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষমতা হারানোর ভয় ছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ভোটের পরোয়াই করেন না। অনেকবার বলেছেন, 'ম্যাঁয় এক চায়ওয়ালা হুঁ। সত্তা নহী রহেগী তো ঝোলা উঠাউঙ্গা অর চলা যাউঙ্গা।' দ্বন্দ্বে-অন্তর্দ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ ভারতীয় রাজনীতিতে এই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ উদাসীনতা নরেন্দ্র মোদীর অবদান।

বিরোধীদের ভয় সেখানেই। সুতরাং তারা নেতিবাচক রাজনীতিকে হাতিয়ার করেছেন। তাদের প্রধান দাবি, মোদী হটাও। অথচ আজ অবধি একজনকেও সর্বসম্মত নেতা হিসাবে উপস্থিত করতে পারেননি। সারা দেশে এমন কেউ নেই যাকে সব বিরোধী দল একযোগে নেতা হিসেবে মানবে। ভারতের আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করে নেবে। বিরোধীরা চিৎকার করছেন বিমুদ্রীকরণের ফলে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেছে। অথচ সাধারণ মানুষ বলছে, যারা এতদিন দেশকে লুটেপুটে খেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ঠিক করেছেন। বিরোধীরা রোজই কোনও না কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। কিন্তু এইসব কর্মসূচি প্রকারান্তরে এনডিএ সরকারের বিবিধ কর্মসূচির প্রতিক্রিয়া। কোনও মৌলিকত্ব নেই। মোদী সরকার গরিব পরিবারগুলিকে ৬,০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া শুরু করেছে। অতএব রাহুলকেও দিতে হবে। ক্ষমতায় ফিরলে তিনি দেবেন ৭২,০০০ টাকা। সিপিএম দেবে ১৮,০০০ টাকা। সিপিআই দেবে ৯,০০০ টাকা। নরেন্দ্র মোদী গরিব মানুষের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধীরা বেশি টাকার টোপ দিয়ে গরিব মানুষকে লোভ দেখাচ্ছেন। কিনতে চাইছেন তাদের ভোট। স্পষ্ট করে দিচ্ছেন দেশীয় রক্ত আর নীল রক্তের পার্থক্য।

বিরোধীদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততই দেশের মানুষ পড়তে পারছেন এক অমোঘ দেওয়াল লিখন। নরেন্দ্র মোদী ছাড়া দেশে এখন কোনও নেতা নেই। চায়ের আড্ডায়, সন্ধ্যেবেলার রকে মানুষ প্রশ্ন করছেন, রাহুল গান্ধীর মতো নেতা যার একটা পঞ্চায়েত চালাবার অভিজ্ঞতা নেই, তিনি দেশ চালাবেন কী করে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তাদের মন্তব্য, দিদি প্রধানমন্ত্রী হতে চান সারদার ফাইল ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। এইসব প্রশ্ন আর মন্তব্য বলে দেয় ঝড় আসন্ন। প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় উঠে এসেছে মোদী-ঝড়ের পূর্বাভাস। তাই সুখের পায়রাদের চোখে ঘুম নেই। ঝড় উঠলে বাসা ভাঙবেই। তখন কী হবে? দেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে না তো সুখের পায়রারা?

বিরোধীদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাই গতি দিয়েছে মোদী-ঝড়ের

অভিমন্যু গুহ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'অ্যান্টি ইমকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' বলে একটি বিষয় রয়েছে। এক দল বেশিদিন সরকারে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের মনে হয় নতুন দলকে সুযোগ দেওয়া দরকার, সরকার পালটে ফেলা দরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' বলা হয়। এই তত্ত্বকে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাদের বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের মাধ্যমে প্রহসনে পরিণত করেছিল, যার উত্তরসুরির ভূমিকা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের এই ব্যতিক্রম বাদ দিলে সর্বভারতীয় স্তরে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর'-এর মান্যতা যথেষ্টই রয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখলে পাঁচবছর আগের মোদী ঝড় এখন যথেষ্ট স্তিমিত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু মোদী ঝড়ের বেগ যে এবার গতবারের থেকেও প্রবলতর, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। একে একে সেগুলি তুলে ধরা যাক।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক কৃতিত্বে ২৮২ টি আসন পেয়েছিল। শতাংশের বিচারে ভোটের হার ছিল ৩১ শতাংশ। দেশের বিরোধী দল আর তাদের পদলেহী সংবাদমাধ্যম চিলচিৎকার জুড়েছিল ৩১ শতাংশ মানুষের রায় কেন ৬৯ শতাংশ দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অস্বীকারের কোনো জায়গা নেই যে আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি কংগ্রেসের, নেতাজী-গান্ধীজীর স্মৃতিধন্য কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ে দলে মৌরসিপাট্টা কায়েম করা জওহরলাল নেহরু এমন এক 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন যাতে আজীবনকাল তাঁর পরিবারের অধীনস্থ কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার থাকে। আর নিরাপদ বিরোধী হিসেবে যেন কমিউনিস্টরা থাকে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাবার এই ব্যবস্থাকেই আর একটু কায়েমি করতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস(আই) অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস গঠনের মধ্যে দিয়ে।

জরুরি আবস্থার সময় বা ১৯৮৯ সালে রাজীব-বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিরোধীরা এক ছাতার তলায় এলেও 'জোট' সম্ভাবনা তখনও ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। ১৯৯৮ সালে বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী তেরো দলের জোট সরকার গঠন করলেন এনডিএ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স গঠনের মধ্যে দিয়ে। এর আগে ১৯৯৬-৯৭ সালে ইউনাইটেড ফ্রন্ট নামে একটি জগাখিচুড়ি জোট সম্ভাবনা তৈরি হয় যার একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ১৯৯৬-এর লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা। অটলবিহারী বাজপেয়ী অনুভব করেছিলেন আঞ্চলিক স্বার্থবাহী প্রচুর রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে, যাদের পেছনে লোকসমর্থন রয়েছে যথেষ্টই। এদের আঞ্চলিক রাজনীতিকে ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসতে না পারলে শক্তসমর্থ ভারতের স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে।

সংসদের দক্ষিণ প্রান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসিরা আর বাম প্রান্তে আজীবনই বামপন্থীরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরা থাকবে। গণতন্ত্রের পক্ষে এই যে চূড়ান্ত বিপজ্জনক মডেল নেহরু-ইন্দিরা তৈরি করতে গিয়েছিলেন তার ফল হয়েছিল মারাত্মক। প্রাদেশিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, সর্বভারতীয় স্বার্থ পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছিল। অটলজীর ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স গঠনের মূলে ছিল দেশীয় স্বার্থকে সুসংহত করা। তাই বহুত্ববাদ ইত্যাদি নিয়ে অনেক লম্বা-চওড়া ভাষণ শোনা যায়। এবং বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে 'বহুত্ববাদ'কে আদতে রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহার কর হয়। অথচ ইতিহাস বলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের জনক বিজেপিরই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অটলবিহারী

বাজপেয়ী। ২০০৪ ও ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অটলজী নিয়ন্ত্রিত ধারাটিকে অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়েছিল সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেস, ২০০৪-এ ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স বা ইউপিএ গঠনের মাধ্যমে।

দেশের প্রতি কংগ্রেসের জমিদারি মানসিকতা কেবল ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস-চেতনার ওপরই নির্মম আঘাত নয়, গণতন্ত্রের বহুমতকে তারা ধূলিসাৎ করে দেশবিরোধিতার মাপকাঠি করে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপ্রদেশ কোথাও এবার জোট করতে পারেনি কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশে রায়বরেলি, আমেঠি বা পশ্চিমবঙ্গে মালদা-মুর্শিদাবাদ- উত্তর দিনাজপুরের দু'একটি আসন বাদ দিলে কংগ্রেসকে যেখানে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেখানে তাদের কীসের অনীহা জোটে যেতে? আসলে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকেরই নানান কায়েমি স্বার্থে আঘাত পড়েছে। মোদী একাই ২৮২, এই পরিস্থিতি অনেকের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস বলছে এই রে আমাদের জমিদারি গেল। আঞ্চলিক দলগুলি ভাবছে আর তো প্রদেশিকতা নিয়ে রাজনীতির জায়গা রইল না। শরিকরাও ভাবছে ব্ল্যাকমেলিং করার আর সুযোগ কোথায়?

এখানেই অঙ্কের হিসেব এনে দিল তাদের হাতে মোক্ষম অস্ত্র। বিজেপি ৩১ শতাংশ, বিরোধীরা সব মিলিয়ে ৬৯ শতাংশ। সুতরাং 'হাতে হাতে ধরি ধরি' করে নানান সংকীর্ণ স্বার্থে দেশের সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করো। ২০১৪-র পর যে ক'টি সংসদীয় উপনির্বাচনে কিংবা রাজ্য নির্বাচনে বিজেপির ফল খারাপ হয়েছে তার মূলে এই 'হাতে হাতে ধরি ধরি' তত্ত্ব রয়েছে। বিজেপিকে আটকাতে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়ো। কেমন জোট? নীতিবাগীশ সিপিএম দুর্দান্ত ভাবে ফাঁস করে দিয়েছে– জোট নয়, আসন সমঝোতা। দেশের মানুষ এর নিহিতার্থ এখন বুঝতে পারছেন। এর অর্থ হলো বিজেপিকে যে-কোনো মূল্যে রোখ, তারপর লুটেপুটে খাও। আদর্শ-ফাদর্শ চুলোয় যাক।

আদর্শহীন রাজনৈতিক দল তৃণমূল সুপ্রিমোর সহজ থিয়োরি হলো, যে যেখানে শক্তিশালী, সে সেখান থেকে লড়বে। হিসেব খুব পরিষ্কার। এ হলো স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি নির্ভর আসন সমঝোতা। বিজেপি বিরোধিতার অজুহাতে বিজেপির থেকে দুর্বলতর দলকে ও বাকি দুর্বল শক্তিকে সংহত করে সবল করে তোলার প্রয়াস, তা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সাংবিধানিক মান্যতা পেলেও নৈতিক মান্যতা পায় কী না তা বিচার করে দেখা দরকার। জোটধর্মের প্রাথমিক শর্ত হলো মূলগত ঐক্য যা প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগের বার্তা দেয়, আসন বণ্টনের সময়েও। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, মায়া-মুলায়ম, কেজরিওয়াল-কংগ্রেস এরকম পারস্পরিক যুযুধান দু'পক্ষ যখন নির্বাচনী সমঝোতায় যাচ্ছে তখন বুঝতে কারোর আর বাকি থাকছে না এদের লক্ষ্যটা স্বার্থসিদ্ধির।

কংগ্রেসের এখন যা হাল তাতে আসন সমঝোতায় গেলে যে যে আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ জুটতো, তাতে সবগুলো জিতলেও প্রধান বিরোধী দল হওয়ার প্রয়োজনীয় আসন মিলতো না। সেই দলের বালখিল্য নেতাকে একাংশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরছে, আর তিনি নাকি বিজেপিকে রুখতে পারলে হাফিজ সৈয়দকেও পাকিস্তান থেকে এনে এদেশের প্রধানমন্ত্রী করতে রাজি।

কানহাইয়া কাণ্ড থেকে শুরু করে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইকের বিরোধিতায় তাঁরা কেবল মোদীকেই নিশানা করেননি, দেশকেও নিশানা করেছেন-- এই কথাগুলি নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, সবাই জানেন। কেবল বলা দরকার, গঠনমূলক বিরোধী জোট থাকলে একবিংশ শতাব্দীর নবচেতনালব্ধ ভারতবর্ষ এই দুর্ভগ্যজনক পরিস্থিতি এড়াতে পারতো, মোদী ঝড়ের গতি স্বাভাবিক নিয়মেই স্তিমিত হতো। কিন্তু 'বিরোধী' নামক ভারত-কলঙ্কদের অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ভারতবাসীকে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে যে, মোদী আর না-মোদীর মধ্যে যেকোনো একজন প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার। আর সেই সূত্রেই ৩১ শতাংশের গ্রাফ বাড়ছে, ৬৯ শতাংশের গ্রাফ কমছে। কারণ দেশবাসী বুঝেছেন, ৩১ শতাংশকে ৫০-এ নিয়ে যেতে না পারলে দেশের সমূহ বিপদ। তাই বিরোধীদের সৃষ্ট নিম্নচাপ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বলয়ে মোদী ঝড়কে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। ঝড়ের পর নির্বাচনোত্তর নতুন ভারতবর্ষ গড়ার আশাতেই বুক বাঁধছেন ভারতবাসী।

এবার পরিবর্তনের পালা শুরু

সৃজিত রায়

কদিন আগেই বাজারে দেখা রাঘবের সঙ্গে। মাছ বেচছে বাবার সঙ্গে। পাশে খাড়া 'সবুজ সাথী' প্লেট লাগানো সাইকেলটা। বললাম— 'কী রে! স্কুলে যাবি না?' রাঘব হালকা হেসে বলল— 'স্কুলে গেলে খাব কী?'

—কেন তোর বাবা কি তোকে খেতে দেবে না বলেছে?

—না কাকু, তা নয়, বাবা একা আর পারছে না।

রাঘবের বাবা বঁটি থেকে মুখ তুলে বলল—

—বয়স তো হচ্ছে। আর কত টানব বল! ছেলেটাকে ব্যবসাটা শিখতেও তো হবে। চাকরি-বাকরি তো আর হবে না।

আমার বাড়ির কাজের লোক অনিমা। ওর মেয়ে ক্লাস নাইনে একটা সাইকেল পেয়েছিল। সবুজসাথী প্লেট লাগানো। এখন সেই সাইকেলটার পিছনে হাঁড়ি বেঁধে পোনা মাছ বেচে অনিমার বর। কারণ মেয়ে আর স্কুলে যায় না।

রাজ্য সরকারের হিসেব, ২০১৫-র অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার মোট ৭০ লক্ষ সাইকেল বিলি করেছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। সবাই নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী। খরচ হয়েছে ২৩০০ কোটি টাকা। উদ্দেশ্য ছিল— যাতে স্কুলছুটের সংখ্যা কমে বা একেবারে বন্ধ করা যায়। না মিথ্যে বলব না। ইউনিসেফের সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে— স্কুলছুটের সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের স্কুলছুটের সংখ্যাটা যত, ছেলেদের স্কুলছুটের সংখ্যাটা তার দ্বিগুণ। এখন আপার প্রাইমারি সেকশানে ২.৩ শতাংশ ছাত্রী স্কুল ছাড়ছে প্রতি বছর। ফলে মোট খরচ ২৩০০ কোটি টাকার অর্ধাংশ অর্থাৎ সাড়ে এগারো কোটি টাকা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ হয়ে গেছে।

* * *

ক্লাস টেনের ছাত্রী মিনুর হাতে নতুন মোবাইল দেখেই সব বন্ধুরা ঘিরে ধরল!

—বাঃ দারুণ তো! কত পড়ল রে?

—বেশি না। সাত হাজারের একটু বেশি।

—কে দিল? বয়ফ্রেন্ড?

—ধুর! বাবা। কন্যাশ্রীর টাকাটা পেলাম না, ২৫ হাজার!

রাজ্যের কন্যাশ্রী প্রকল্প রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুরস্কার পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সদলবলে জেনেভা গিয়ে বাংলার গর্বের ট্রফি আর সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। ওই প্রকল্পেই বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার কম রোজগার এমন পরিবারের ছাত্রীরা এককালীন ২৫ হাজার টাকার অনুদান পেয়ে থাকে। বেশি কড়াকড়ি নেই। ফলে এ পর্যন্ত ওই প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা ৫৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫১১ জন। অপেক্ষায় রয়েছে আরও দেড় লক্ষের বেশি আবেদনকারিণী। এখনই খরচ বছরে ১২০০ কোটির বেশি। ভোটের মুখে পারিবারিক আয়ের সীমারেখাটা তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোটিপতির মেয়েও যদি ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে না করে তাহলেই কড়কড়ে অনুদান। তো মেয়েরা মোবাইল কিনবে না? সিনেমা দেখবে না? রেস্তোঁরায় যাবে না? কেউ কেউ অবশ্য বাবা-মায়ের হাতেও তুলে দিচ্ছে— তারপর বেরিয়ে পড়ছে ছেলেরা রোজকারপাতির ধান্দায়। মেয়েরা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

* * *

রূপশ্রী প্রকল্প। খুব সুনাম। টাকার অভাবে অবিবাহিত মেয়েদের বাবাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার জন্য হাতবাড়ানোর প্রকল্প। আবেদন করলেই হাতে হাতে ২৫ হাজার টাকা। তবে বিয়ে যে হচ্ছে তার প্রমাণ হিসেবে দিতে হবে নিমন্ত্রণ পত্র। পারিবারিক আয় দেড় লাখ হতে হবে, তবে প্রমাণ চাই না। এ যাবৎ সরকারি ভাবে মোট বাজেট রাখা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। নভেম্বর মাস পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজারের বেশি। খরচ হয়েছে ২০৩০ কোটি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন ৫৫০০ আবেদনপত্র নাকি বাতিল হয়ে গেছে। ভালো কথা। কিন্তু অপাত্রে দান হলো কিনা তা দেখা হচ্ছে তো? সব মেয়ের বিয়ে হলো তো? নাকি বিবাহের মনগড়া নিমন্ত্রণ পত্র ৫০ টাকা দিয়ে ছাপিয়ে ২৫ হাজার টাকার অনুমোদন দেওয়া হলো? সেরকম হাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় কিন্তু পাড়াতুতো রাজনৈতিক দাদারা এরকম বদবুদ্ধি দিচ্ছেন নানা ক্ষেত্রে বলে শোনা যাচ্ছে। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

* * *

আসা যাক স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিল বা দ্বিপ্রাহরিক ভোজন প্রকল্পে। প্রকল্পটি কেন্দ্রের। এরাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার স্কুলে এক কোটি তিরিশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী দুপুরে নিজ নিজ স্কুলে ভাত, ডাল, সবজি, ডিমের ভোজ খায়। ২০১০ সালে এই প্রকল্পটি রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, প্রকল্পটিকে ঘিরে ততই সমালোচনার ঝড়

বয়েছে। কারণ হিসেবে শাসকদলের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকেই দায়ী করছে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি। সাম্প্রতিক হিসেবে (বর্তমান পত্রিকা ২৬ মার্চ ২০১৯) দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিনই গড়ে ১ হাজারেরও বেশি স্কুলে এই পরিষেবা বন্ধ থাকছে। কোনো কোনোদিন সেই সংখ্যা দু' হাজার বা তিন হাজারও হয়ে যায়। কারণ হয় নানা কারণে স্কুল বন্ধ থাকছে, নয়তো চাল ডাল বাড়ন্ত অথবা রাঁধুনি অনুপস্থিত। ছাত্র-ছাত্রী ব্যাগে করে থালা বয়ে নিয়ে এসেও অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছে। গত ৫ মার্চ রাজ্যে ৩৫৩৬টি স্কুলে মিড-ডে মিল বন্ধ ছিল। কারণ ওইদিন রাজ্যে ২৬৮টি স্কুল বন্ধ ছিল। রাঁধুনি আসেনি ১৯৮টি স্কুলে। এছাড়াও নানা কারণে মিড-ডে মিল পরিষেবা বন্ধ ছিল ২৯১৮টি স্কুলে। ৭ মার্চ ২৩০টি স্কুলে মিড ডে মিল দেওয়া হয়নি। ১৪ মার্চ ছেলে-মেয়েরা ভাত পায়নি মোট ১১৪৩টি স্কুলে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের হিসেব অনুযায়ী, ১৩ তারিখে ২৭১৪টি স্কুলে মিড ডে মিল পায়নি ছাত্র-ছাত্রীরা। খাবার তৈরির জন্য উপকরণই পৌঁছায়নি ৪০টি স্কুলে। তার আগে ১৮ ডিসেম্বরে ১৪,৬৭২ স্কুলে দুপুরের ভাত ডাল জোটেনি। ৬ নভেম্বর জোটেনি ৩৪৯৫ স্কুলে। ৯ জানুয়ারি পরিষেবা বন্ধ ছিল ১৫৩৫ স্কুলে। এবছর ৫ মার্চ ৩৫৩৬ স্কুলে বন্ধ ছিল মিড ডে মিল। ১৫ মার্চ খাবার জোটেনি ২৪০৩টি স্কুলের হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের। অথচ বছর বছর মোট জাতীয় খবরের ১০.০৭ শতাংশ খরচ হচ্ছে মিড ডে মিলের জন্য। অতএব কোন বস্তার ফুটো দিয়ে গলে গিয়ে চাল ডাল কোন ইঁদুরের পেট ভরাচ্ছে তা শুধু সঠিক তদন্তেই ধরা পড়বে। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!

* * *

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ খেয়াল হলো রাজ্যে ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়া দরকার। কী কারণে? খেলাধুলার উন্নয়নে। তা বেশ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বছরে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান পাচ্ছে নাটকের ক্লাব, জলসার ক্লাব কিংবা তাস, ক্যারম খেলার ক্লাবও। কম নয় সংখ্যায় ২০ হাজার। এ পযন্ত খরচ হয়েছে ৬০০ কোটি। বেশির ভাগ ক্লাবেরই নতুন ভবন হয়েছে। জমিয়ে দুর্গাপুজো হয়েছে। পার্টি, নাচগান, খানাপিনা, পিকনিকও। যুবশক্তি মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!

* * *

আর ২০১৮-তেই তুঘলকি মুখ্যমন্ত্রী বলা নেই কওয়া নেই, আলোচনা নেই, ঘোষণা করে দিলেন, রাজ্যের ২৮ হাজার দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিটি কমিটিকে দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। ব্যস, এক রাতেই খতম ২৮ কোটি টাকা। টাকাটা জনগণের। মুখ্যমন্ত্রীর নয়। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!

এভাবেই এরাজ্যে চলছে নানা 'শ্রী' প্রকল্প। প্রতিদিন। উন্নয়নের নজির। শুধুই অনুদান। অনুদান? নাকি ঘুষ? নাকি গরিব মানুষের সব সম্মান কেড়ে নিয়ে ভিখারি বানানোর চক্রান্ত? যুবশক্তিকে কিনে নিয়ে ভোটের মস্তানিতে লাগানোর ধান্দা? আর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে শামিল করার জন্য শুধুই অনুপ্রেরণার হরির লুট! তা লুটের টাকাটা আসছে কোথা থেকে? সারদা, নারদায় ভালোই কামিয়ে দিল শাসকদল। কিন্তু নিঃশব্দ নোটবন্দির ঠেলায় বহু টাকাই জলে গেছে। কিছু ভাঙানো গেছে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু সবটা হয়নি। সেজন্যই তো বিযোদ্গার। সেই যাই হোক— এইসব টাকা শ্রীমতী অনুপ্রেরণাদেবী কোথা থেকে পাচ্ছেন? আসুন ছানবিন করি।

রাজ্যের ঘাড়ে এই মুহূর্তে দেনার পরিমাণ তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার কোটি টাকা। ১ এপ্রিল সেটা গিয়ে দাঁড়াবে ৪,৩১,৯২৮ কোটি টাকায়। অর্থাৎ রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু দেনার পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের মৃতদেহ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকার দেনা রেখে গিয়েছিল। তারপর পরিবর্তনের সরকারের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় ২০১৪-১৫-য় তা হয় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি। পরের বছর ২ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি। ২০১৬-১৭-য় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি, ২০১৮-১৯-এ এই সময় তা ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩২২ কোটি টাকায়। যা রাজ্যের সামাজিক রাজস্বের ৮১ শতাংশের সমান। মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝেই দাবি জানান, কেন্দ্র ঋণ মুকুব করছে না। আগামীদিনে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারবে না। উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে।

আপনি এখন গৌরী সেন সেজেছেন। নিজের টাকায় নয়। পরের টাকায় পুণ্যি অর্জন করতে চাইছেন। কিন্তু সবাই সব বুঝে গেছে, জেনে গেছে। একটু কান পাতুন। কী শুনতে পাচ্ছেন দিদিমণি? গুরুগম্ভীর স্লোগান— 'আর না আর না। এই দিদিমণি আর না। এই সাদা শাড়ি আর না। এই সাদা চটি আর না। এই ভিক্ষের দান আর না। এই চক্রান্ত আর না।

এবার পরিবর্তনের পালা শুরু।'

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ১৭ মার্চ হাওড়া জেলার আমতার হরিশপুর ভবতারিণী আশ্রমে প্রসিদ্ধ সমাজসেবী সংস্থা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১২৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১০৫ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬৫

জনের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা ও ইসিজি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহ সম্পাদক জীবনময় বসু এবং সম্পাদক তপন গাঙ্গুলী।

গত ২৪ মার্চ মালদহের সাহাপুর সারদা শিশুমন্দিরে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় এবং গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের উদ্যোগে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৯০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৯ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ নন্দী, সম্পাদক তপন গাঙ্গুলি, সহ সম্পাদক জীবনময় বসু, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত প্রমুখ।

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রশিক্ষণ

গত ২৫ মার্চ নদীয়া জেলার কল্যাণী বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদিনের কৃষি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল গবেষণা প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪০ জন কৃষক, কৃষি সম্প্রসারক ও সংগঠক অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও উদ্যান বিজ্ঞানের অধ্যক্ষবৃন্দ এবং

গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকর্তারা। কৃষি সংগীত পরিবেশন করেন সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র। ফলচাষ বিষয়ে ৭টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে সেই পুস্তিকা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বর্গে অখিল ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি নন্দলাল কাট ও রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিল রায় উপস্থিত ছিলেন। শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের উন্নত ফল নানান চারা বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন বিশিষ্ট কৃষি প্রবন্ধিক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

শিলিগুড়িতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পরিবার প্রবোধন সভা

গত ১৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে শিলিগুড়ি শহরের ঋষি ভবনে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন স্বাতী প্রসাদ। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর। অনুষ্ঠানে ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের আলোচনা সভা

গত ২৪ মার্চ নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ ঔষধি বিকাশ অনুসন্ধান সংস্থার সভাকক্ষে 'ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস্ অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা', 'কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ ঔষধি বিকাশ অনুসন্ধান সংস্থান', 'কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রালয়', এবং 'অল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অব আয়ুর্বেদ' এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'ফার্মাকো ভিজিলন্স ইন আয়ুর্বেদ'।

এই সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাঃ প্রশান্ত কুমার সরকার ও ডাঃ অচিন্ত্য মিত্র। সভায় ১০০ জন আয়ুর্বেদ ছাত্র-ছাত্রী ও চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

বসন্তেই মহামায়ার প্রথম আরাধনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এ সবই মহামায়ার লীলা।

স্মিত আস্যে বলেন ঋষি মেধস। আর তাতেই ধন্দ বাড়ে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজন-ছাড়া বৈশ্য সমাধির। তাই একই সঙ্গে তাঁদের জিজ্ঞাসা, কে এই দেবী মহামায়া— কা হি সা দেবী মহামায়া?

চিরন্তন এ প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঋষি বলেন, এই দেবীই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। ইনিই জগৎ প্রসব করেছেন। এঁরই মায়ায় মুগ্ধ এ ত্রিজগৎ। এঁরই মায়ায় আচ্ছন্ন এ বিশ্বসংসার।

রাজা সুরথ। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ছিল তাঁর রাজনীতি। তাই প্রজারা ছিল সুখেই। কিন্তু তারই মধ্যে ঘটল বিপর্যয়। এক শত্রুর আক্রমণে হঠাৎই হলেন পর্যুদস্ত। চলে এলেন নিজের রাজধানীতে।

এসে দেখেন সেখানেও হয়েছে পালা বদল। তাঁরই কিছু অসৎ মন্ত্রী ও কর্মচারী দখল করে নিয়েছে তাঁর ধনসম্পদ সবকিছু। তার চেয়েও বড়ো কথা, তাদের এই কাজের সহযোগী হয়েছে তাঁরই স্ত্রী-পুত্র ও আপন পরিজনরা। নিজ পুরেই তখন তাঁর জীবননাশের আশঙ্কা। তাই সবকিছু ছেড়ে একরকম পালিয়েই এলেন তিনি। আশ্রয় নিলেন মেধস মুনির আশ্রমে।

কিন্তু মন ভালো নেই তাঁর। রাজ্য ও সম্পদ হারানোর দুঃখের চেয়েও মন তাঁর এলোমেলো নিজের স্ত্রী-পুত্র-স্বজনদের আচরণে। সেই দুঃখকেও ছাপিয়ে কিন্তু বারবার মনে হতে থাকে তাঁর সেই স্বজনদের কথাই। ভালো আছে তো সকলে? প্রজারা শোষিত হচ্ছে না তো!

অশুভ কিছু তাড়িত করছে না তো তাদের।

নিজের এই ধরনের ভাবনায় রাজা নিজেই অবাক। বারবারই ভাবেন, কেন এমন হচ্ছে? যাদের জন্য আজ তাঁর এই অবস্থা। তাদেরই মঙ্গল-অমঙ্গল বা শুভ-অশুভ নিয়ে কেন তিনি এত বিচলিত! এত চিন্তিত!

উত্তর পান না। আর তাই বিমনা রাজা একাই ঘুরতে থাকেন আশ্রমে এদিক ওদিকে। আর তখনই দেখেন তাঁরই মতো বিষণ্ণমনা একজনকে। কী এক বিষাদে যেন আত্মমগ্ন ব্যক্তিটি। কৌতূহল হয় রাজার। এগিয়ে যান তাঁর কাছে। জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি? কী হয়েছে তোমার? কেন তোমার এমন মলিন বসন?

চমক ভাঙে ব্যক্তিটির। রাজাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। বলে, আমার নাম সমাধি। বৈশ্য আমি। বাণিজ্য করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হই আমি। কিন্তু কী জানি কিসের প্রভাবে হঠাৎই দেখি আমার আত্মজনরা আমার সবকিছু দখল করে নিয়েছে। প্রাণে না মেরে তারা আমাকে বিতাড়িত করেছে। তাই আমি এখানেই আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু এখানে এসেও পড়েছি এক বিষম জ্বালায়।

সব কিছু জানার জন্য মুখিয়ে থাকা রাজা বলেন, কেন, কিসের জ্বালা? কী পীড়িত করছে তোমাকে? এই তপোবনে তো এমন হবার কথা নয়!

সমাধি জানায়, এই আশ্রমের কোনো কিছুর জন্য নয়, সে তাড়িত তার মনের বিচিত্র ভাবনায়। বলে, তার একান্ত নিজের লোকেরাই তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। অথচ তারাই কেমন আছে ভেবে এখনও আকুল সে। বলতে পারেন কেন এমন হচ্ছে?

কী বলবেন রাজা। তিনি নিজেও যে খুঁজছেন এর উত্তর। তাই ক্ষুণ্ণ মনেই বলেন, কী আর বলবো তোমাকে! আমিও যে খুঁজছি তোমারই মতন— এ প্রশ্নের উত্তর। আমারও যে তোমারই মতো দশা। যে নিকটজনরা সব কিছু হরণ করে আমাকে রাজ্যচ্যুত করেছে— তাদের কথা ভেবেই আমিও যে ব্যাকুল। আমিও যে

তোমারই মতো খুঁজছি এমন বিচিত্র ভাবনার কারণ। খুঁজে খুঁজে হয়রান, তবুও পাইনি উত্তর।

একই দুঃখের শিকার রাজা আর বৈশ্য নীরবেই সমবেদনা জানাতে থাকেন পরস্পরকে। তারপর রাজাই বলেন, চলো, আমরা বরং ঋষির কাছে যাই। তিনিই বলতে পারবেন এর উত্তর। সেই মতোই ঋষিকে প্রণাম করে জানান তাঁদের মনোবেদনার কথা। তারই উত্তরে হেসে বলেন ঋষি, এসবই মহামায়ার লীলা।

সে কথায় পিঠে দুজনেই জানতে চান। সেই দেবী মহামায়ার কথা। তাঁদের সেই জিজ্ঞাসার খিদে মেটাতেই বিশদ হন ঋষি। শোনান দেবীর উৎপত্তি ও নানা লীলার কথা। বলেন, নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। উৎপত্তি বিনাশ রহিতা জগন্মূর্তি এই মহামায়া নিত্যা। এই সমগ্র চরাচর জুড়ে রয়েছেন তিনি। যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনিই করেন অশুভ শক্তির বিনাশ। প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম ও শুভকে। কল্পে কল্পে আসেন তিনি নানা রূপে— নানা ভাবে।

কল্পান্তে এই জগৎ জলময় হলে তাতেই অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত হন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর নাভিপদ্মে ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা। সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত দুষ্ট অসুর মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে গ্রাস করতে যায়। ভীত ব্রহ্মা সেসময় বিষ্ণুর সেই ঘুম ভাঙানোর জন্য যোগনিদ্রারূপী মহামায়ার স্তব করতে থাকেন নানা ভাবে। স্তবে তুষ্ট নিদ্রারূপী দেবী বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন। জেগে উঠে বিষ্ণু বধ করেন অসুর মধু-কৈটভকে। ত্রাসমুক্ত হন ব্রহ্মা।

আরেকবার মহিষ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের আক্রমণে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলেন। স্বর্গহারা দেবতারা অসুরের ভয়ে পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে পালিয়ে বাঁচতে চান। কিন্তু কোনো ভাবেই অসুরের ভয় কাটাতে না পেরে তাঁরা এক সময় ব্রহ্মার নেতৃত্বে করে যান বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে। জানান, তাঁদের দুর্দশার কথা।

সব শুনে ক্রুদ্ধ হর ও হরি। তাঁদের ভ্রূকুটি কুটিল আনন থেকে নির্গত হতে থাকে মহাতেজ। সেই তেজের সঙ্গে মিলিত হয় ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারও তেজ। আর তখনই সেই মহাতেজরাশি থেকেই উৎপন্ন হন ত্রিভুবনমোহিনী অপরূপা দেবী মহামায়া। সমবেত দেবতারা তাঁকে সাজান নানা আভরণে। নানা প্রহরণে। প্রণাম করে জানান তাঁদের দুঃখের কথা। প্রার্থনা জানান তাঁদের এ দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য।

অসুরের অত্যাচারের কথা শুনে হুংকার দেন দশপ্রহরণধারিণী দেবী। আহ্বান করেন সেই দৈত্যপতি অসুর মহিষকে। শুরু হয় মহারণ। সে যুদ্ধে দেবী নিধন করেন অসুর মহিষকে। দেবীর সেই অপার কৃপা ও শৌর্যে বিমোহিত দেবতারা নানা ভাবে স্তবস্তুতি করতে থাকেন। সে স্তবে তুষ্ট হন দেবী। বর দিতে চান দেবতাদের। বলেন, যখনই বিশ্বে প্রবল হবে অধর্ম, অশুভ শক্তি যখনই সদগর্বে বিনিষ্ট করতে যাবে শুভ ও মঙ্গলকে তখনই তিনি আভির্ভূত হবেন এই ভাবেই। এই ভাবেই আবার প্রতিষ্ঠা করবেন সৎ-সুন্দর-কল্যাণ শক্তিকে।

দেবতারা বলেন, যখনই বিপদে পড়বেন তাঁরা, তখনই এই ভাবেই যেন আবির্ভূত হন দেবী। স্মরণমাত্রই এই ভাবেই তিনি যেন এভাবেই দূর করেন সব আপদ। তাঁদের প্রার্থনা, যে মানুষ তাঁদের এই স্তব দিয়ে দেবীর স্তুতি করবে তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি যেন তাদের জ্ঞান দেন। শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। ধন সম্পদের বৃদ্ধি করেন।

তাই হবে বলে প্রসন্ন দেবী অন্তর্হিত হন সেখান থেকে। শুধু এই একবার নয়, যুগে যুগে কল্পে কল্পে এই ভাবেই দেবতাদের উদ্ধার, অশুভশক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠায় আবির্ভূত হন দেবী। তাঁর স্তবস্তুতি করলে প্রতিশ্রুতি মতোই তিনি মানুষের সব আপদ দূর করেন। ঘটান শ্রীবৃদ্ধি।

সুরথ ও সমাধিকে একথা শুনিয়ে ঋষি মেধস বলেন, তোমরা এই মহামায়ার আরাধনা করো। তাহলেই দূর হবে সব সংকট। ফিরে পাবে তোমরা তোমাদের সব হারানোর সম্পদ।

ঋষির কথায় রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দেবীর মৃন্ময়মূর্তি তৈরি করে শুদ্ধ মনে তাঁর পূজা ও স্তব স্তুতি করতে থাকেন। তাঁদের অর্চনায় পরিতুষ্ট দেবী আবির্ভূত হন তাঁদের সামনে। তারপর সুরথ এবং সামাধিকে দেন তাঁদের বাঞ্ছিত বর। বলেন, সুরথ ফিরে পাবেন তাঁর রাজ্য। ভোগ করবেন তা পরম সুখ— শত্রুমুক্ত হয়ে। আর সমাধি, তুমিও লাভ করবে পরমা ভক্তি ও জ্ঞান। পাবে মুক্তি।

দেবী মহামায়ার বরে জন্মান্তরে সুরথ হন সাবর্ণি মনু। উৎপন্ন হন সূর্য থেকে। হন পৃথিবীপতি, আর সমাধিও পান মুক্তি। স্থান পান দেবীর চরণে চিরকালের মতো।

মেধস মুনির নির্দেশে সুরথ আর সমাধি চৈত্রের শুক্লপক্ষে করেছিলেন মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর আরাধনা। দেবীর মৃন্ময়ীমূর্তি গড়ে শুদ্ধভাবে চারদিন তাঁরা দেবীর অর্চনা করেন। বসন্তকালে তাঁরা এই আরাধনা করেছিলেন বলে বিশেষ ভাবে তা পরিচিত বাসন্তীপূজা নামে।

সুরথ ও সমাধি দেবীর অর্চনা করেন উত্তরায়ণে অর্থাৎ দেবতাদের দিন বা জাগরণের সময়। তাই বাসন্তী পূজার আলাদা করে তাদের জাগানোর প্রয়োজন হয় না। তাই এ পূজায় নেই বোধন।

ত্রেতায় সীতাহরণকারী রাবণকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র এই দেবী মহামায়ারই পূজা করেছিলেন শরৎকালে। তিনি পূজা করেন অকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে— দেবতাদের রাত্রি বা নিদ্রার সময়। তাই পূজার আগে দেবীশক্তিকে জাগাতে বোধন বা জাগরণের অনুষ্ঠান করেন। এই অকালবোধনের অবশ্য অঙ্গ তাই বোধন।

শারদীয়া নবরাত্রির মতোই বাসন্তী পূজার সময়ও ন'দিন ধরে পালিত হয় নবরাত্র উৎসব। শারদীয়া নবরাত্রির মতোই একই ধারায়।

সম্ভবত ঋতুবৈচিত্র্যের কারণই বাসন্তী নয়, শারদীয়া অকালবোধনই সারাদেশে বেশি প্রচলিত। বাসন্তী পূজা এখন মূলত বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গেই বাসন্তীপূজার প্রচলন বেশি ছিল। কিন্তু এখন এই পশ্চিমবঙ্গেও পারিবারিক বাসন্তী পূজা সর্বজনীন পূজাতেও পরিণত হয়েছে। ▮

বাগবাজার সেন পরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্নপূর্ণা পুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ স্থিত শ্যামপার্কের উত্তরে ৪৪ নম্বর রামকান্ত বসু স্ট্রিটের সেন বাড়িতে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই (১৯০০ সাল থেকে) অন্নপূর্ণা মাতার আরাধনা হয়ে আসছে। সেন পরিবারের আদিপুরুষ ভবনাথ সেনের সহধর্মিণী জয়কালী সেন ১৯০০ সালে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) সেন বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজোর সূচনা করেন, অবিচ্ছিন্নভাবে যা আজও অব্যাহত। অন্নপূর্ণা পুজোর বর্ণনায় যাবার আগে সেন পরিবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেন পরিবার বাগবাজারের (তৎকালীন কাঁটাপুকুর অঞ্চল) একটি অভিজাত এবং বনেদি পরিবার। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন এই পরিবারের কৃতী সন্তান। পরিবারের অন্য সদস্যরাও কর্মজীবনে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন বা আছেন। ভারতের জাতীয় ক্লাবের স্বীকৃতি পাওয়া মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেন পরিবারের পূর্বসূরিরা।

হুগলি জেলার জনাইয়ের মিত্র পরিবারের কন্যা জয়কালী মাত্র নয় বছর বয়সে ভবনাথ সেনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ভবনাথ সেন এবং তাঁর অগ্রজ ব্রহ্মনাথ সেন সেই সময় (ইংরেজি ১৮৫৯ সাল) উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে মাতুলালয়ে বাস করতেন। ভবনাথ সেনের সেই অর্থে কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। কিন্তু নিজস্ব চেষ্টা, নিষ্ঠা, সততা ও কর্মকুশলতায় তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। বিবাহের এক বছর পরে ১৮৬০ সালে ভবনাথ ৪৪ নম্বর রামকান্ত বোস স্ট্রিটের বাড়িটি ক্রয় করেন। ভবনাথ সেনের সহধর্মিণী জয়কালী সেন বধূ হিলাবে এসে পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সেন পরিবারের তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল 'ছোটমা' হিসাবে। তিনি বেথুন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। নিজের হাতে গড়া বিরাট সংসারে উত্তরসূরিদের যাতে চিরদিন অন্ন সংস্থান বজায় থাকে, এই বাসনায় জয়কালী সেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮ এপ্রিল ১৯০০) অন্নপূর্ণা পুজোর সূত্রপাত করেন। এবার পুজো ১২০তম বর্ষে পদার্পণ করলো। প্রথমাবধি একই ঠাকুরদালানে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জয়কালী সেন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিপ্রাণা রমণী। তাঁর সুদক্ষ সংসার পরিচালনা ও পরস্পরের প্রতি স্নেহের বন্ধন সেন পরিবারকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত একান্নবর্তী রেখেছিল। স্বামীর জীবদ্দশায় ১৯০৯ সালে জয়কালী সেনের জীবনাবসান হয়। পারিবারিক অন্নপূর্ণা পুজোয় আমরা সচরাচর যেরকম মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত, সেন পরিবারের মূর্তিতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মা অন্নপূর্ণা ডান পা মুড়ে বাম পায়ের উপর রেখে উপবিষ্টা। নানাবিধ অলংকারে সজ্জিতা অপূর্ব মাতৃমূর্তি। ডান দিকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে মহাদেব দণ্ডায়মান। বাম দিকে মহাদেবের সহচর নন্দী। দুই পাশে অন্নপূর্ণার দুই সহচরী জয়া ও বিজয়া। কুমোরটুলির একই মৃৎশিল্পী পরিবার বংশ পরম্পরায় প্রতিমা নির্মাণ করছেন।

অন্নপূর্ণা পুজোর দিন সকালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরপর বাড়ির প্রত্যেকে অন্নপূর্ণা মাকে ও মহাদেবের ঝুলিতে কাঁচা আম, পৈতে ও চাল দেবে, এটাই রীতি। এরপরেই সেন বাড়িতে কাঁচা আম খাওয়া শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে কুমারী পুজো, সধবা পুজো, ধুনো পোড়ানো, অঞ্জলি প্রদান, ভোগারতি, হোমকুণ্ড প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। যিনি 'ব্রতী' হন, তিনি মাথায় একটা আর দু' হাতে দুটো মালসা নিয়ে বসে কাঠ-কয়লার আগুনে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ধুনো পোড়ান। পুজোর সংকল্প হয় পরিবারের দীক্ষিত মহিলার নামে এবং পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্জলা উপবাসে থাকেন। আগে মূল নৈবেদ্য হতো এক মন চালের। এখন কুড়ি সের চাল লাগে মূল নৈবেদ্যতে। সেন পরিবারের অন্নভোগের প্রথা নেই। তার বদলে লুচি, বিভিন্ন রকমের ভাজা, ডাল, ক্ষীর, দই, হালুয়া, চাটনি ও পাঁচ-ছয় রকমের মিষ্টি মা অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অন্নপূর্ণা পুজোয় আমন্ত্রিত হয়ে সেন বাড়িতে এসেছেন। ভবনাথ সেনের নির্দেশ ছিল— 'এ বাড়ি থেকে কেউ যেন অভুক্ত ফিরে না যায়'। বর্তমান প্রজন্মও পূর্বসূরির নির্দেশ সম্বন্ধে সজাগ থাকেন।

পরদিন সকালে দশমী পুজো শেষে দধিকর্মার পরে মায়ের বিদায়ক্ষণ এগিয়ে আসে। উঠোনে বড়ো করে আলপনা দেওয়া হয়। গৃহিণীদের নিপুণ হাতের রঙিন আলপনায় চিত্রায়িত হয়ে ওঠে উঠোন। বৈচিত্র্যময় সুদৃশ্য আল্পনা সেন বাড়ির গৃহিণীদের শিল্পশৈলীর পরিচায়ক এবং এটা সেন বাড়ির স্বকীয়তাও। তারপর মা অন্নপূর্ণাকে আসন থেকে উঠোনে নামানো হয়। মহিলারা বরণের নানা জিনিস নিয়ে গোল হয়ে সাতবার মাতৃমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করেন। এরপর বয়সের ক্রমানুযায়ী প্রত্যেকে মা-কে বরণ করেন। বরণ অনুষ্ঠান যে এত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হতে পারে, চাক্ষুষ না করলে কল্পনা করা যায় না। সবশেষে কণকাঞ্জলি দিয়ে মা অন্নপূর্ণা-কে বিদায় জানানো হয়। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

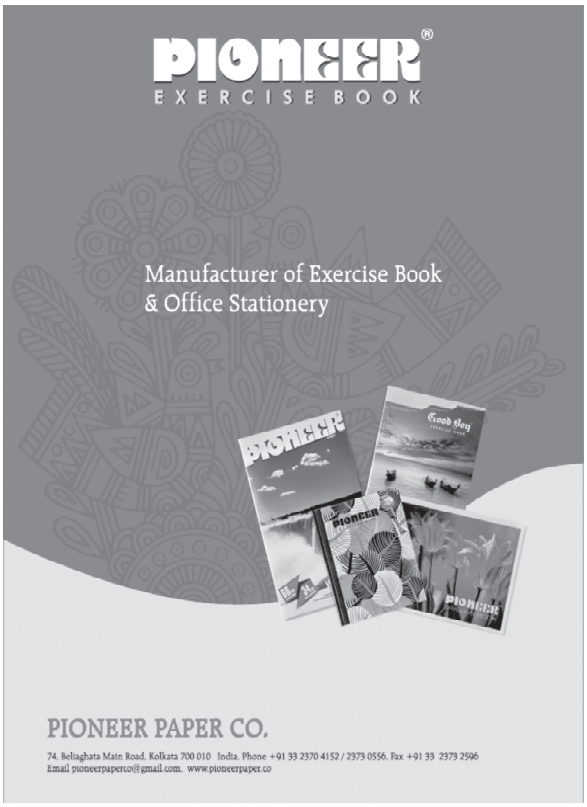

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

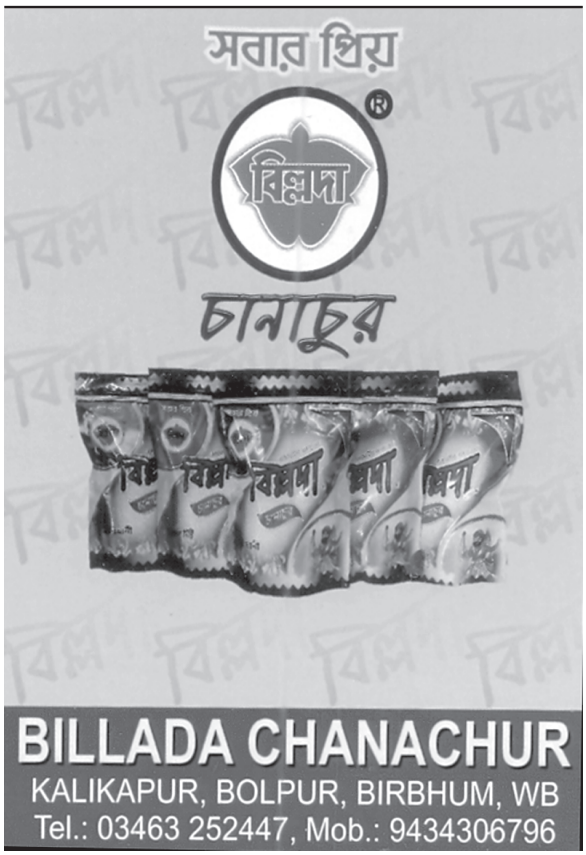

যার চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখে রাঙাবেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কলকাতা থেকে সুন্দরবনের দূরত্ব মাত্র একশো কিলোমিটার। সুন্দরবনের ছোটোবড়ো দ্বীপমালার কোনও একটি দ্বীপের এক গ্রামের নাম রাঙাবেলিয়া। কয়েক দশক আগে এই গ্রামে যারা বাস করতেন তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। হয়তো সেরকমই থেকে যেত। কিন্তু একজন মানুষ এলেন, দেখলেন এবং রাঙাবেলিয়ার জীবন অনেকটাই বদলে দিলেন।

আগন্তুকের নাম তুষার কাঞ্জিলাল। অশীতিপর কিন্তু বৃদ্ধ নন। রবীন্দ্রভক্ত এই মানুষটিকে সুন্দরবনের পরিত্রাতা বলে মনে করেন জলজঙ্গলের প্রতিটি মানুষ। পঞ্চাশ বছর আগে তুষারবাবু এখানে এসে সুন্দরবনের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেল এখানকার মানুষের দুরবস্থা দেখে। ঠিক করলেন এখানে থেকে সুন্দরবনের মানুষের জন্য কাজ করবেন। পরিবর্তন আনবেন এখানকার অভাবগ্রস্থ জীবনযাপন।

নিশ্চিত জীবনের মোহ ছেড়ে তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত জীবন বেছে নেওয়া সহজ নয়। কিন্তু তুষারবাবুর অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই কঠিন কাজ সহজ হতে পেরেছে সহজেই। তুষারবাবু বলেন, 'বেশিরভাগ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারজয়ী কবি বলে জানে। কিন্তু তিনি যে কতবড়ো গ্রাম-সংগঠক ছিলেন, গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য কী করেছিলেন— সে কথা খুব কম লোকই জানে। বিশেষ করে শ্রীনিকেতনের যে তিনটি গ্রাম তিনি দত্তক নিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে আজকের শান্তিনিকেতন হয়ে ওঠে— সেখানকার কাজ দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। তার কাছ থেকেই শিখেছি, সমাজসেবার কাজ করার সময় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা কতটা জরুরি।'

এরপর শুরু গ্রাম খোঁজার পালা। যেখানে প্রথম আসবে পরিবর্তন। সেই গ্রামই রাঙাবেলিয়া। তুষারবাবু বলেন, 'আমি সারাদেশ ঘুরে শেষে নিজের রাজ্যে সুন্দরবনের দ্বীপে রাঙাবেলিয়ার সন্ধান পেলাম। যে সময়ের কথা বলছি তখন এই গ্রামে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। পানীয় জল, চিকিৎসা, পাকারাস্তা, যানবাহন— কিচ্ছু না। শিক্ষাদীক্ষার হালও ছিল খুব খারাপ। সিদ্ধান্ত নিলাম সব ছেড়েছুড়ে এখানেই থাকব আর এখানকার মানুষকে সাহায্য করব।'

১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তুষারবাবু রাঙাবেলিয়ায় বসবাস করছেন। কেটে গেছে ৫০ বছর। এখানকার মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তুষারবাবু। পাঁচটি দশক ধরে তিনি রাঙাবেলিয়াকে অনেক কিছু দিয়েছেন। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এই অরণ্যকে, বিশেষ করে এখানকার ভুবনবিখ্যাত বাসিন্দা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছেন আধুনিকতম প্রযুক্তির আশীর্বাদ। আধুনিক পৃথিবী এবং সুন্দরবনের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন একমাত্র ব্রিজ।

ভারত এবং বাংলাদেশে প্রায় ২০ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরেছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সুন্দরবন বিপন্ন। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রে জল বাড়ছে। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে দ্বীপগুলো। ম্যানগ্রোভ বৃক্ষকে (শিশু, সুন্দরী, গরান) যদি বাঁচানো না যায় তাহলে একদিন হয়তো চিরকালের মতো সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। তার জন্য তিনি জোর দিয়েছেন সুন্দরবনের নরম মাটি ধরে রাখার ওপর। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই। সুন্দরবন পেয়েছে লড়াই করার রসদ।

তুষারবাবু বলেন, 'শুরুতে বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল এখানকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। যাতে তারা অধিকার অর্জন করার জন্য লড়াই করতে পারে। তবে সব থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা। মানুষ একদিন ধ্বংস করবে, এই জন্য তো আর প্রকৃতি এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেনি! পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতন উদাসীনাতার জন্যই আশেপাশের গ্রামগুলির অবস্থা দিন-দিন খাপার হয়ে পড়ছিল। অরণ্যরক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি এখানকার মানুষকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। পেরেছি কিনা জানি না।'

এখানকার মানুষ স্বীকার করেন, তুষারবাবু না থাকলে সুন্দরবন সেই মান্ধাতার আমলেই থেকে যেত। গণ-বনসৃজন প্রকল্প থেকে শুরু করে ম্যাগ্রোভ বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্প— সব কিছুতেই তুষারবাবুর স্পর্শ। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মান যেমন পেয়েছেন দায়িত্বও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। এখন তিনি সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সদস্য, টাস্কফোর্স ফর প্রিপারেশন মাস্টার প্ল্যান ফর দা এনটায়ার রিজিওনের চেয়ারম্যান এবং ন্যাশনাল কমিটি ফর প্রমোশন অব ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সম্মানিত সদস্য।

কিন্তু অর্থ বা যশ তার লক্ষ্য নয়। সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটলে তার ভালো লাগে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ আর অন্যদিকে এই ভালোলাগা তাকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে। চুরাশিতে পৌঁছে তিনি তার অনুপ্রেরণার উৎস বদলাতে চান না। ▮

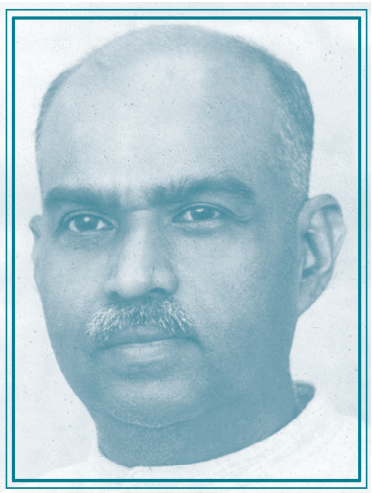

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাকে শ্রদ্ধা জানাতে নতুন ভারত গড়তে হবে

কৃষ্ণা দাস (মাইতি)

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মূলত শিক্ষাবিদ ছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের প্রতিকারের জন্য রাজনীতিতে এসেছিলেন।

১৯০৯ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন হলো।

আবার মুসলমানরা স্বদেশি আন্দোলনকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। ব্রিটিশরা একটা অখণ্ড শক্তিশালী জাতিকে ভেঙে দু'টুকরো করার চক্রান্তে সফল হয়ে গেল।

১৯০৬ সালে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' হওয়ার ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কার্যত ইংরেজদের বিভাজন নীতিকে স্বীকার করে নিল।

শুধু বাকি থাকল ভৌগোলিক বিভাজন। ১৯৩৪ সালে মহম্মদ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য 'হোমল্যান্ড'-এর জোরজার দাবি উঠল। ১৯৩৭ সালে হলো সাম্প্রদায়িক বণ্টনের ভিত্তিতে নির্বাচন।

১৯৩৭ সালে বাংলার আইনসভার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড-এর ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য সংখ্যাধিক্য আসন সংরক্ষিত হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আইনসভায় জিতেও অসহায় নির্দল সদস্য ছিলেন। তাঁকে সেই আইনসভায় মন্ত্রী করার প্রস্তাব করেছিলেন হুমায়ুন কবীর, যিনি পরে নেহরুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রাজ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

কিন্তু মুসলিম সদস্যদের তীব্র বিরোধিতায় শ্যামাপ্রসাদের আর মন্ত্রী হওয়া হয়ে ওঠেনি আইনসভায়। যদিও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখনও 'হিন্দু মহাসভায়' যোগ দেননি। বরং তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর, স্যার হাসান সুরাবর্দিকে অনেক সাহায্য করেছিলেন তিনি।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রবল ব্যক্তিত্বের গুণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। বিশেষ করে হিন্দুসমাজের মুখ হয়ে ওঠেন।

তিনি মনেপ্রাণে ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। আবার মুসলিম লিগের যথেচ্ছাচারেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ২ জুন মাদুরায় সাকারকারের সভাপতিত্বে 'হিন্দু মহাসভার' অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দাবিকে তুলে ধরেন। তাঁর দাবি ছিল— দেশভাগ নয়, চাই— রিয়েল ট্রান্সফার অব পাওয়ার টু দি পিপল্। এই অধিবেশনে তিনি আহ্বান করেন, হিন্দু যুবশক্তি যেন দেশের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। প্রয়োজনে তারা দেশের কাজও করতে পারবেন।

১৯৩১ সালের জনগণনা যা কার্যত ১৯৪১ সালে হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ জনগণই প্রকৃত শক্তির উৎস।

বর্ণহিন্দু ও তপশিলি হিন্দুদের মধ্যে ভাগ না করে তিনি হিন্দু ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। মুসলিম লিগ এতে বিপদের গন্ধ পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় মুখর হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে টাউনহলে এক বিশাল জনসমাবেশ হয়। সেখানে বাংলার মুসলিম লিগ ও ফজলুল হক মন্ত্রীসভার পতনের দাবি ওঠে।

১৯৪২-১৯৪৩-এর বাজেট বক্তৃতায় শ্যামাপ্রসাদ জোর দেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়ে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তিনি। যদিও তাঁর এই উদার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন আইন সভার মুসলিম লিগ ও ইউরোপীয়ান সদস্যরা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সত্যিসত্যিই এক অখণ্ড বাংলা তথা ভারতের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন তার প্রমাণ বাংলার অসাম্প্রদায়িক, উদার ও বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সস্ত্রীক অসুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি মধুপুরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত ঋণও কিছুটা মেটানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ নিজেকে সমর্পণ করেন কখনও মেদিনীপুরের বন্যা, ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত জনগণের আবার কখনও (১৩৫০) মন্বন্তরে ক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর সেবায়। হিন্দুর ভোট নিয়ে কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করতে পারে, অথচ হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে কংগ্রেস অক্ষম এবং নিজেদের হিন্দু-প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতেও রাজি নয়। এর চেয়ে হিন্দুর দুর্ভাগ্য কী আর হতে পারে?

আজকের পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিদের আত্মসমালোচনা করা উচিত যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্যই সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে। খানসেনাদের নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার আজকের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সহ্য করতে হয়নি। অথচ নিজভূমিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্রাত্য কারা তাকে সাম্প্রাদায়িক আখ্যা দেন— যাদের তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে গেছেন।

প্রশ্ন করতে হয়, মুসলমান বাঙ্গালিকে, খ্রিস্টান বাঙ্গালিকে, দলিত বাঙ্গালিকে, জনজাতি বাঙ্গালিকে, হিন্দু বাঙ্গালিকে, সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন বাঙ্গালিকে, সর্বদলীয় বাঙ্গালিকে— তার কি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন বলিদানকে অস্বীকার করতে পারেন? তিনি কী তাদের রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেননি?

আজ সময় এসেছে, প্রকৃত শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিয়ে ভারতকেশরী, পশ্চিমমবঙ্গের রূপকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে তর্পণ করে পাপস্খালন করার। ভারতমাতার এই মহান সন্তানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন বঙ্গ তথা ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙে’র সমর্থকরা দেশোদ্ধারের জোট করেছে

প্রীতীশ তালুকদার

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগের সেই দৃশ্য যখনই মনে পড়ে শরীর মন অপার ঘৃণা আর ক্ষোভে দগ্ধ হতে থাকে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি। টিভির পর্দায় ভেসে উঠল দৃশ্যটা। দিল্লি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীর জমায়েত হয়েছে। নেতা গোছের কয়েকজন মুষ্ঠি তুলে তুলে স্লোগান দিচ্ছে আর বাকিরা তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। কয়েকটা দল পরস্পর কাঁধে কাঁধে হাত রেখে গোলাকার হয়ে সেই স্লোগানে মাতন তুলে নাচছে। ‘‘কিতনে আফজল মারোগে, ঘর-ঘরসে আফজল নিকলেগা’’, ‘‘আফজল হাম শর্মিন্দা হ্যায়, তেরা খুনি আভি জিন্দা হ্যায়’’, ‘‘ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে ইনসাল্লা ইনসাল্লা’’, ‘‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’’ ইত্যাদি। অধিকাংশেরই মুখ ঢাকা। একেবারে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা, সুর ও কায়দা।

কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্যদের কে চিনত ওই দিনটির আগে? কেউ কী ওদের নামটাও শুনেছিল? কী ওদের অবদান যে শুনবে জানবে? রাতারাতি সারাদেশে পরিচিত, নেতা। রাজনীতির প্লাটফর্ম তৈরি হয়ে গেল। টাকাও আসতে থাকবে নানা পথ ধরে। বিপরীত পথ দিয়ে। এদের লক্ষ্য অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি। তাতে ভগবানকে শয়তান বানাতে হবে। মানুষকে ভাগ করে বিদ্বেষের ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে হবে, সন্ত্রাস করতে হবে, দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশটাকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে কোনো অসুবিধা নেই। ভালো কাজ করে বড়ো হবার কী দরকার, পথে নামো দেশ বিরোধী স্লোগান তোলো, ভাঙচুর পাথরবাজি কর, গাড়ি পোড়াও তবেই সংবাদের শিরোনাম হবে, পরিচিতি হবে, দেশের ভিতর বাসা বেধে থাকা দেশের শত্রুদের শিরোমণি হবে, রাজনৈতিক দলের কাছে কদর বাড়বে, সংবাদিকরা বিতর্কিত বাইটের জন্য ছুটবে।

অজস্র ত্যাগ আর আত্মবলিদানের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করে প্রাপ্ত স্বাধীন ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই দেশটার বিরুদ্ধেই চক্রান্তে লিপ্ত হবে, দেশটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে আওয়াজ তুলবে তা সংবিধান প্রণেতারা কল্পনা করতে পারলে হয়তো চরম ঘৃণা আর ক্ষোভে প্রকাশ্য পথে গুলি করে মারার বিধান দিয়ে যেতেন। তিন বছর ধরে জে এন ইউ-র অফিসিয়াল তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি টিভি ফুটেজ, সংবাদ মাধ্যম ও সেখানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইলে তোলা ১৯টি ভিডিও ফুটেজ, ঘটনার সময় ও আগে পরে অভিযুক্তদের মোবাইল ফোনের অবস্থান মেসেজ ও ফোনকল এবং নব্বই জন সাক্ষী-সহ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ ও আরও কিছু অন্তর্তদন্তকে ভিত্তি করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কেচ্ছার চার্জশিট পেশ হয়েছে

গত ১৪ জানুয়ারি। বামপন্থীদের নয়নের মণি কানাইয়া কুমার, উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং কাশ্মীরি সাত ছাত্র ইয়াকুব হুসেন, মুজিব হুসেন, মুনিব হুসেন, উমর গুল, রাইয়া রসুল, বসির ভাট, বাসারত— এই দশ জন প্রধান অভিযুক্ত। এই কাশ্মীরি সাত ছাত্রের মধ্যে পাঁচজনই আবার জে এন ইউ-র ছাত্রই নয়, তারা আন্দোলন করতে এসেছিল। এছাড়াও অভিযুক্ত বামপন্থী নেত্রী সেহলা রশিদ, সিপিআইএম নেতা ডি. রাজার মেয়ে অপরাজিতা রাজা-সহ বেশ কিছু।

আদালতে এখন প্যাচঘোচ চলবে। এ আদালত ও আদালত চলবে। তবে যেটা পাল্টাবে না তা হলো নির্ভেজাল সত্যি প্রমাণিত উনিশটা ভিডিও ক্লিপ, যাতে স্পষ্ট দেখা ও শোনা যাচ্ছে ওই দেশদ্রোহীদের দেশ ভাঙার স্লোগান। এই ভিডিওগুলোকেই ডক্টরস্ বলে চিৎকার জুড়ে ওই দেশদ্রোহীদের হয়ে ফাটিয়েছিল এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আর রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রকাশ কারাত, মমতা ব্যানার্জিরা। কেজরিওয়াল তো নিজে উদ্যোগ নিয়ে ভিডিও সংগ্রহ করে হায়দরাবাদে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁরই মুখ পুড়েছে। কানহাইয়া কুমাররাও এত হোমরা-চোমরাকে পাশে পেয়ে অভিযোগ তুলেছিল মোদী চক্রান্ত করে জালি ভিডিও বানিয়েছে। ভিডিওটাকেই জালি প্রমাণের প্রয়োজন পড়েছিল, তার কারণ তারা সকলেই জানত ওটা ছিল চরম দেশদ্রোহিতা। ওরা খুব সচেতন ভাবে দেশদ্রোহিতায় নেমেছিল। রাহুল গান্ধী ও তার কংগ্রেস, কারাত ও তার সিপিএম, কেজরিওয়াল ও তার আপ, মমতা ব্যানার্জি ও তার তৃণমূল কী দেশদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীমোদীকে দোষারোপ করার জন্য এখন লজ্জিত?

ওরা লজ্জিত হবে না। সভাটা ছিল সুপ্রিম কোর্টে ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত জঙ্গি আফজল গুরুর। এর আগে ওরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ করে মহিষাসুরকে শহিদ আখ্যা দিয়ে মহিষাসুর দিবস করেছে আর দেবী দুর্গাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছে। এরা দেশ ভাঙার স্লোগান তুলবে না তো বন্দে মাতরম্ গাইবে! সব জেনে বুঝেই ওরা খুব সচেতন ভাবে নিজ নিজ মুখ ঢেকে রেখেছিল পরিচয় আড়াল করতে। হঠাৎই ওরা অমন দেশদ্রোহিতা শুরু করেছে তা ভাবার অবকাশ নেই। ওদের ঘটনা গভীর ও বিস্তৃত চক্রান্তজালের সামান্য প্রকাশ মাত্র। পুরো জাল ও জেলেদের খুঁজে শাস্তি দেওয়া দরকার দেশের নিরাপত্তার জন্য। ওই সমর্থকরাও সব জেনেশুনেই ওদের সমর্থনে ঝাঁপিয়েছিল, এখনও তা করছে। এরা জঙ্গিদের সমর্থন করে, কাশ্মীরি পাথরবাজদের সমর্থনে পথে নামে, দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি ধরা পড়া আই এস জঙ্গিদের সমর্থন করে মোদীজীকে দোষারোপ করে। ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করলে এরা তার প্রমাণ চায়। এরাই তো মোদী তথা বিজেপি বিরোধী জোট করে দেশ উদ্ধার নেমেছে। ভারতবাসী শুধুমাত্র ভোটার নয়, দেশপ্রেমী সচেতন নাগরিক। ভোটের বোতামে এদের যোগ্য জবাব দিতেই হবে।■

শ্বেতকেতুর শিক্ষা

অনেক অনেক বছর আগে উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু। যখন তার বয়স বারো বছর হলো তখন ঋষি তাকে গুরুর আশ্রমে বেদ শিক্ষার জন্য পাঠালেন। বারো বছর গুরুর আশ্রমে থেকে বিভিন্ন বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করে চব্বিশ বছর বয়সে পিতার কাছে ফিরে এলেন। তার পিতা লক্ষ্য করলেন শ্বেতকেতুর কথাবার্তায়, আচার আচরণে দাম্ভিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাকে খুব অহংকারী মনে হচ্ছে। পিতা বুঝলেন তাঁর পুত্রের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়নি। কারণ যে জ্ঞানী সে অহংকারী হয় না। তার শিক্ষা কোনো কাজে লাগে না।

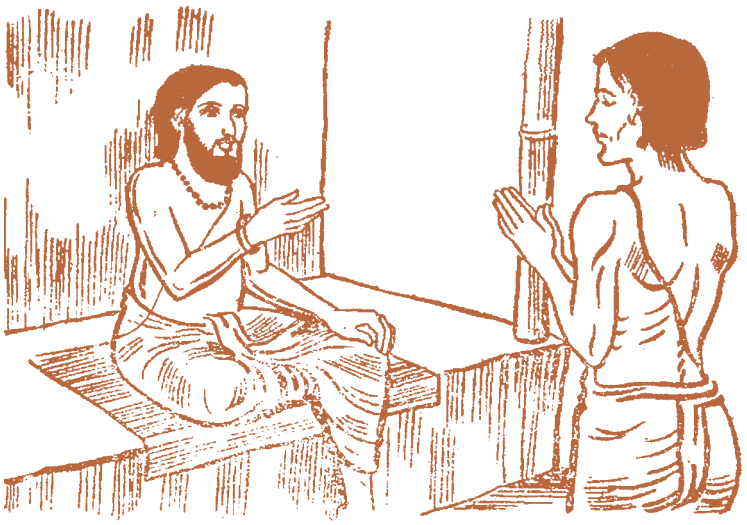

ঋষি উদ্দালক পুত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু রাগ সংবরণ করে পুত্রকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি কী কী শিক্ষা লাভ করে এসেছ? শ্বেতকেতু উদ্ধত ভাবে উত্তর দিলেন, সমস্ত বিদ্যা আমি অধিগত করেছি ,সবই আমার কণ্ঠস্থ। আপনি আমাকে যেকোনো শাস্ত্র থেকে জিজ্ঞেস করুন পিতা। ঋষি বললেন, যাঁকে জানলে সব কিছুকে জানা যায় এমন কথা কি তুমি জেনেছ বা শুনেছ? শ্বেতকেতু ভাবতেই পারেনি যে তার পিতা এমন প্রশ্ন করতে পারেন। আর এমন কিছু যে থাকতে পারে সে বিষয়ে তার কোনো কল্পনাই ছিল না। তাঁর পিতা বললেন—যেমন ধরো, মাটি। মাটিকে জানলে মাটির তৈরি সব কিছুকে জানা যায়। তাই মাটি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এ পৃথিবীর সব কিছুই ব্রহ্ম। এমনকী অন্ন-জলও ব্রহ্ম। হা হা করে হেসে উঠলেন শ্বেতকেতু। বললেন, মাটি, অন্ন-জল আবার ব্রহ্ম হয় নাকি? ঋষি মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি পুত্রকে কঠিন ভাবে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। পুত্রকে বললেন, আজ থেকে তুমি সম্পূর্ণ নির্জলা উপবাস থেকে পনেরো দিন পর আমার কাছে এসো।

পনেরো দিন নির্জলা উপবাস থেকে শ্বেতকেতু কাহিল হয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু নেই। ষোলো দিনের দিন অতি কষ্টে পিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পিতা তাঁকে একটি আসনে বসতে বললেন। তারপর বললেন, তুমি বারো বছর গুরুগৃহে থেকে যা যা শিখে এসেছ তার থেকে কিছু কিছু শোনাও। আশ্চর্যের কথা, শ্বেতকেতু বারো বছর গুরুগৃহে যা কিছু শিখেছেন ও কণ্ঠস্থ করেছেন তার একটি কথাও মনে পড়ল না। মাথা নীচু করে বসে রইলেন। পিতা তার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, যাও, পেট ভরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় আবার এসো।

শ্বেতকেতু মায়ের কাছে গিয়ে পেট ভরে খাবার খেলেন। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও ঘুমিয়ে নিলেন। তাঁর শরীর সবল হয়ে উঠল। মন সতেজ হলো। আর আশ্চর্যের বিষয়, এবার গুরুগৃহে যা যা শিখেছেন তার সবই মনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যেয় পিতার কাছে এসে বসলেন শ্বেতকেতু। বললেন, এবার আমি সব কথাই বলতে পারি। চার বেদ থেকে অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করতে লাগলেন। ঋষি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, শরীর দুর্বল ও মন নিস্তেজ থাকলে জ্ঞানলাভ হয় না। আর অহংকার জ্ঞানলাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, তোমার পেটে ব্রহ্মরূপ অন্ন-জল ছিল না। চমকে উঠলেন শ্বেতকেতু। চোখে জল। পিতার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন পিতা। ঋষি উদ্দালক বললেন, এখন তুমি প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপযোগী হলে। কাল সকালে আমি তোমাকে উপদেশ দেব।

পরদিন সকালে শ্বেতকেতু পিতাকে প্রাণাম করে দাঁড়ালেন। ঋষি বললেন, এই পৃথিবীর সবকিছু ব্রহ্মের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। শ্বেতকেতু বললেন, কিন্তু তাঁকে তো দেখা যায় না। ঋষি বললেন, সবকিছু চোখে দেখা যায় না। জ্ঞানলাভ হলে তুমি তা বুঝতে পারবে। ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে, তা ভাঙলে শাঁস ছাড়া কিছু দেখা যায় না। অথচ তার মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ লুকিয়ে রয়েছে। এই বিশ্বের যা কিছু সবই বৃক্ষের রূপ। শ্বেতকেতু অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। ঋষি আবার বললেন, এক পাত্র জলে লবণ ফেলে দিলে আর লবণ দেখা যাবে না। কিন্তু সেই জল মুখে দিলে লবণের স্বাদ পাওয়া যাবে। তেমনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতে ব্রহ্ম মিশে আছেন। তাঁকে দেখা যায় না। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে হয়। তপস্যার দ্বারা যে এই ব্রহ্মকে জানতে পারে সেই জ্ঞানী। পৃথিবীতে তার আর অজানা কিছু থাকে না। তুমি এই ব্রহ্মের সাধনা কর শ্বেতকেতু। ভারতবর্ষের সাধনা হলো ব্রহ্মের সাধনা।

হরিপদ ঘোষ

ভারতের পথে পথে

বেট দ্বারকা

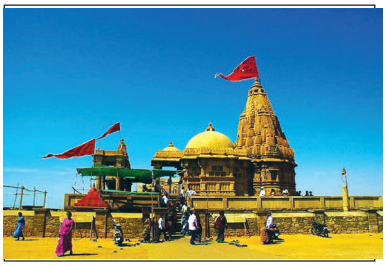

দ্বারকা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম ভারতের শেষ প্রান্তভূমি ওখা। বাণরাজার কন্যা ঊষার নাম থেকেই কালে কালে নাম হয়েছে উখা। শহরে ঢুকবার মুখেই রয়েছে বেট দ্বারকার ফেরিঘাট। আরব সাগরের বুকে ভেসে ৫ কিলোমিটার জলপথ বেট দ্বারকার। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামার আনা ভেট থেকেই এই নাম হয়েছে। আরও নানান কাহিনি আছে। অতীতে শঙ্খাকার বেট দ্বারকার নাম ছিল শঙ্খদ্বার তীর্থ। গুজরাটি ভাষায় বেট শব্দের অর্থ দ্বীপ। দ্বীপময় দ্বারকা, তাই বেট দ্বারকা। স্থানীয় লোকজনের দাবি, এই বেট দ্বারকাই শ্রীকৃষ্ণের মূল দ্বারকা। পুরো বেট দ্বারকা মন্দিরময়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর রানিদের নানা মন্দির রয়েছে। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সারা বছর ভিড় লেগে থাকে

জানো কি?

বিভিন্ন ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদক ও প্রকাশ কাল

- সুইডিস - আন্দ্রে বুঁতেস্ক
  ১৯১৩
- দানিস - লুইস ভি কোহল
  ১৯১৩
- জার্মান - মারি লুই গঁথে
  ১৯১৪
- ফ্রেংচ - আঁন্দ্রে জিদ
  ১৯১৪
- ডাচ - ফ্রেজরিক ভন এডেন
  ১৯১৪

ভালো কথা

হোলির আনন্দ

হোলির দিনে মনে কেমন একটি আনন্দ উল্লাসের ভাব সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় হোলি সবাইকে আপন করে নেবার উৎসব। এবারও হোলির দিন সকালে বাবার সঙ্গে আমি সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে যথাসময়ে হাজির হলাম। একটি গানের পর শুরু হলো রং খেলা। একটু পর আর কাউকে চেনাই যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মা আর বোন এসে পড়লো। রাস্তায় গান গাইতে গাইতে রং খেলতে খেলতে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় যাকে দেখি তাকেই রং লাগাই। বড়োদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করি। এই আনন্দের দিনেও কয়েকজন সাফাইকর্মী মুখ বুজে রাস্তা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল। তাদেরও আমরা রং মাখালাম। ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারা আমাদের আশীর্বাদ করল। কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে আমরা রং মাখালাম। তারা আমাদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালো। এতদিন পাড়াতে কয়েকজন মিলে রং খেলেছি কিন্তু এই প্রথম এত লোক একসঙ্গে রং খেললাম। বাড়িতে যখন ফিরছিলাম তখন পাড়ার কেউ আমাদের চিনতেই পারছিল না। এত আনন্দ মনে হয় এবার প্রথম পেলাম।

সম্মান নন্দী, সপ্তম শ্রেণী, ১১, চন্দ্র শূর লেন, কলকাতা-৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমি আঠেরো

অর্ণব সাহা, দ্বাদশ শ্রেণী, হিলি দক্ষিণপাড়া, দঃ দিনাজপুর।

আমি এবার আঠেরো
দেশ গড়ার চাবিকাঠি আমারও হাতে,
শক্ত দেশ সমর্থ দেশের জন্য
আমার মতো পড়বে ভোট আরও।
আমি দেব ভোট শক্ত হাতে
দেশ গড়ার কাজে অংশীদার আমি,
বুদ্ধিহীনরা নোটার বোতাম টেপে
আমি অনেক ভালো বন্ধু পারি জোটাতে।
আমি এখন আঠেরো
দেশ এগিয়ে যাবে আরও।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৭।।

মহালয়া বাঙ্গালির স্মৃতিমেদুরতার ছবি

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বদলে উত্তম,ডাল বাংলা

মহালয়া প্রসঙ্গে আকাশবাণী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৬ সালের এক শরতের প্রাক-প্রত্যুষে বাঙ্গালি ধড়ফড় করে ঘুম চোখে উঠেছিল। এক অতিদীর্ঘ পরম্পরার এমন আকস্মিক উধাও হয়ে যাওয়ায় আক্ষরিক অর্থেই হাঁসফাঁস করেছিল। বিতর্ক হয়েছিল প্রলম্বিত। চিরকালীন দেবী দুর্গার আগমনী মহালয়ার ব্যারিটোন ভয়েস বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বিকল্প হিসেবে চণ্ডীপাঠ করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। বাঙ্গালি তার প্রিয় মহানায়কদেরও মননতন্ত্রীতে জড়িয়ে যাওয়া বীরেন্দ্রর মহালয়ার বদলি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি।

আজ যেমন বাসস্টপেও গান বাজে তখন তা ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালি তার চিরকালীন পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরতে হাওড়া স্টেশনের অভ্যন্তরেও বিকেলবেলা মহালয়ার টেপ বাজিয়ে দিয়েছিল। সময়টা ছিল জরুরি অবস্থার। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের মতে না মেলায় আগেই নিষিদ্ধ করেছিলেন কিশোর কুমারের মতো গায়ককে।

অনুষ্ঠানের খোলনলচে পাল্টাতে তাঁরা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় উত্তমকুমারকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভূমিকা নিতে রাজি করান। কুণ্ঠিত ও অপাদমস্তক বাঙ্গালি উত্তম গভীর রাতে উত্তর কলকাতায় বীরেন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে তাঁর অশ্বস্তির কথা বলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র উত্তমকে সবুজ সংকেত দেন। শোনা যায় মহালয়া শেষে প্রাপ্ত ৫০০ টাকার চেকটি উত্তম আকাশবাণী দপ্তরে জমা দিয়েই ফেরেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর মহালয়া আর কখনই শোনা যায়নি।

বঙ্গম

এমন একটি বিচিত্র বিষয় যা আচম্বিতে বাঙ্গালি মানসিকতায় ঝড় তুলেছিল তা নিয়ে বিশদ গবেষণা করে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি না হলেও অসাধারণ Docu-feature বানিয়েছেন তরুণ পরিচালক মৌলিক সেন। ছবিতে বাঙ্গালি চাক্ষুষ করতে পারবে তৎকালীন আকাশবাণী কলকাতার অন্দরমহলের দ্বিধা দ্বন্দ্ব। মহালয়া নিয়ে হেমন্তের সঙ্গে প্রবাদপ্রতিম পঙ্কজ মল্লিকের বাদানুবাদ। জরুরি অবস্থার সময়ে সরকারের মুখপাত্র হয়ে ওঠা আকাশবাণী পরিচালকের নেতিবাচক চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছেন প্রসেনজিৎ। ছবির প্রযোজনাও তাঁরই। ওপরওয়ালার অদৃশ্য উপস্থিতিই যে সমস্ত অনুষ্ঠানের নিয়ামক তার একটা প্রচ্ছন্ন আন্দাজ সদাই অনুভূত হয়।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের হাঁটাচলা বাচনভঙ্গি সড়গড় করতে জগন্নাথ বসু সহ আকাশবাণীর সমসাময়িক কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বলে জানা যায়। ছবিতে হেমন্ত-অনুগত উত্তমকুমারের উপচে পড়া গ্লামারের ঝলক যীশু সেনগুপ্ত তাঁর লাবণ্যময় চেহারায় আপ্রাণ তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনিও মহানায়কের ওঠা বসা নিবিড় যত্নে অনুশীলন করেছেন। কিন্তু শুভাশীস ও যীশু কেউই সরাসরি অনুকরণে যাননি তাহলে তাঁরা ব্যর্থ হতেন। দেবাশিস মিশ্র বর্তমান বর্তমান প্রজন্মের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত পরিচালক। তাঁর পরিমিতি বোধ নিখুঁত। অকারণে ছবিটিতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সংগীতবহুল না করে আগাগোড়া আসন্ন দুর্গোৎসবের এক মায়াবী সুর তিনি আদ্যপ্রান্ত ভাসিয়ে রেখেছেন। চলচ্চিত্র জীবনে তুমুল আত্মবিশ্বাসী মহানায়কের বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বিকল্প হতে সদা কুণ্ঠিত অভিব্যক্তির চিত্রায়ণে যীশু সুন্দর। মহানায়ককে কীভাবে তাঁর অনুরাগীরা সদা ঘিরে রাখত তারও খণ্ড চিত্র আকাশবাণীর অন্দরে পাওয়া যায়। ছবিটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে আছে বাঙ্গালির অনন্দ, স্মৃতি মেদুরতা। সৌমিক সেন ও তাঁর কলাকুশলীরা এমন একটি অভাবনীয় বিষয়ে যে ১০৮ মিনিটের একটি টানটান ছবি পরের প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে গেলেন তার জন্য সাধুবাদ। ■

পাঠককে ঋদ্ধ করার মতো গ্রন্থ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইতিহাসে ব্যতিক্রমী' বইটি যখন হাতে পেলাম এক নজরে মনে হয়েছিল আর পাঁচটা জীবনী গ্রন্থের মতো হবে হয়তো। সেই ভুল ভেঙে গেল 'ভারত বন্ধু বিদেশিরা' নিবন্ধটি পড়ে। এই লেখাটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত খেয়াল-এর বন্দিশের মতো ধরে রেখেছে বইটির মূল সুরকে। চারিত্রিক অনুধ্যানের এই তন্বিষ্ঠ প্রয়াসে অবিস্মরণীয় স্বল্পায়ু জীবনের প্রতিবেদনটি পাঠককে অভিভূত করবে। একই কথা বলা যায় মহারাজ নন্দকুমারের জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রেও। কলকাতা পুরসভার ভূতপূর্ব মহানাগরিক 'স্টার' রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবনের মতো দুটি ইতিবাচক ইতিহাস রক্ষার কথা বলেছিলেন। (১) বামাচারী শাসকদের হাতে কলকাতা ময়দানের অনিন্দ্যসুন্দর (ব্রিটিশদের বসানো) মূর্তিগুলোর ঢুলি সমেত বিসর্জনের বিরোধিতা করে পুনর্বাসনের ভাবনা। (২) হেস্টিংস অঞ্চলে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির স্থানটিকে চিহ্নিত করে স্মারক নির্মাণের চিন্তা। বলাবাহুল্য এদুটি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। লেখক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবি করেছেন। সেই সঙ্গে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই মহাপ্রাণ মানুষটির জীবনকে।

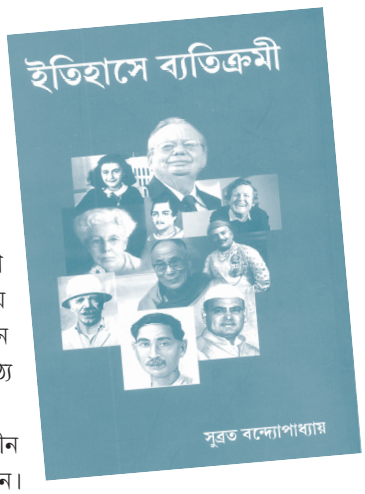

ভারত ভূস্বর্গের স্বরূপ উন্মোচনে কলহন অধ্যায়টি লেখকের অসামান্য প্রয়াস ও বইটির সেরা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। লেখক যে প্রশংসনীয় দক্ষতায় রাজতরঙ্গিণীর আটটি তরঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটি বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই লেখাটি স্কুলপাঠ্য হওয়ার যোগ্য।

রহস্য মোড়া দলাই লামা ও উত্তরাধিকারহীন ফিরোজ গান্ধীকে নিয়ে লেখা দুটিও মূল্যবান সংযোজন। পাঠককে লেখক বেশ কিছু অজানা তথ্য জানিয়েছেন। পাঠক জেনেছে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের অকালপ্রয়াত স্বামী রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত মূল রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ করেন যার ইংরেজি মুখবন্ধ লেখেন জওহরলাল। কিন্তু সুব্রতবাবু জানাননি রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় এই অনুবাদ করেছিলেন।

লেখক আর একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন ভারত প্রেমিক এন্ড্রুজ সম্পর্কে। C.F. Andrews-এর ভারত প্রীতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বয়ং গান্ধীজী আদ্যক্ষর CFA-কে Christ's Faithful Apostle বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। লেখক এটাও জানিয়েছেন গান্ধীজীকে এন্ড্রুজই কেবলমাত্র 'মোহন' বলে সম্বোধন করতেন। সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে গান্ধীর দেশবাসীকে সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার আহ্বানের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'তোমার এই সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আহ্বানের আবেদন তোমারই প্রচারিত অহিংসাতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী।' লেখকের এই বিশেষ প্রয়াসটি সম্প্রতি উদ্ধার হওয়া এক মূল্যবান ঘটনাক্রমের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। সেটি হলো ইংরেজ বিরোধিতায় গান্ধীজীর দোলাচল কিংবা সচেতনভাবে 'চতুর' অবস্থান। United Educational Foundation in India (USEF)-র একদা প্রধান ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক উমা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক উমা দাশগুপ্ত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে পরিবেশিত অজানা চিঠিপত্রের সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর এন্ড্রুজকে কবি গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন একটি বিশেষ বার্তা দিয়ে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলেন অমৃতসরে গিয়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাপু তাতে রাজি হননি। তার পরে নিজে শেষরাতে জোড়াসাঁকো থেকে এলগিন রোডে গিয়ে দেশবন্ধুকে কবি অনুরোধ করেছিলেন মনুমেন্টের পাদদেশে এক প্রতিবাদ সভা ডাকতে। দেশবন্ধু কবিকেই উদ্যোগী হতে বলেন। ভগ্নহৃদয় কবির সঙ্গে প্রদোষকালে প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ যখন দেখা করতে যান তখন কবি সদ্য নাইটহুড ত্যাগ করার পত্রে স্বাক্ষর করছেন। প্রশান্তচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন 'চিত্ত আমাকে সভা ডাকতে বলল। আমি কবি, তাই কবি হিসেবে এই সিদ্ধান্তই নিলাম।'

অমিতাভ চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে প্রস্তাব নেওয়ার অনুরোধ করে জওহরলালকে চিরকুট দিয়েছিলেন অমল হোম। লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি মোতিলাল নেহরু সেই প্রস্তাব পেশই না করায় হোমকে মহম্মদ আলি জিন্না বলেছিলেন, 'তুমি ভুল লোকের কাছে চিরকুট দিয়েছিলে। আমাকে দিলে না কেন, আমি নিজে ডায়াসে উঠে এই প্রস্তাব পেশ করতাম।' ক্ষুব্ধ জিন্না কদিন পরে শান্তিনিকেতন থেকে কবির দীর্ঘপত্র আনিয়ে মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে সভা ডেকে পাঠ করেন। সুব্রতবাবুর এই ব্যতিক্রমী অনুসন্ধানী প্রয়াস এখানে এক মূল্যবান অনুঘটকের কাজ করেছে। লেখকের কলমকে কুর্নিশ করতেই হয়।

ইতিহাসে ব্যতিক্রমী চরিত্রগুলির মধ্যে 'ইসলাম কী ছিল? কী হয়েছে?' লেখাটি অন্য গোত্রের হলেও উদার ও সহনশীল মাক্কী (মক্কায় অবস্থানকালে) মহম্মদের অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক মাদানি (মদিনা অধ্যায়) মহম্মদে রূপান্তরের তথ্যে পাঠক ঋদ্ধ হবে।

সর্বোপরি প্রিটোনিয়ার কর্ণধার পিনাকী দত্ত মহাশয় বইটির প্রকাশ করে প্রকাশনা জগতে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

ইতিহাসে ব্যতিক্রমী
লেখক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশক : প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স। মূল্য : ১৫০ টাকা।

অশোক গেহলটদের আর এস এস কটাক্ষ শোভন নয়

মনীন্দ্রনাথ সাহা

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন, বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর এস এস-এর রাজনৈতিক দল গঠন করা উচিত। কেননা আর এস এসের সম্মতি ছাড়া কেউ মন্ত্রী হতে পারেন না। গেহলট আরও বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর এস এস কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অশোক গেহলটদের এহেন বিষোদ্গার সঙ্ঘের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে। আর এস এসের জন্ম ১৯২৫ সালে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মও ১৯২৫ সালে। কংগ্রেসের বর্তমান বয়স ১৩৪ বছর, আর এস এস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বয়স ৯৪ বছর করে। অথচ কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি এখন ক্ষয়িত দল হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করে চলেছে। পক্ষান্তরে আর এস এস বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের মধ্যে এতবড় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আর একটিও নেই।

সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রসঙ্গে গেহলটজী আসল খবরটি চেপে গেলেন কেন বোঝা গেল না। সেটা হলো ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস আর এস এসকে বেআইনি ঘোষণা করে কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাসেও কোনভাবেই সঙ্ঘের প্রতি অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে ১৯৪৯ সালের ১২ জুলাই সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং সঙ্ঘ নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আবার ১৯৭৫ সালে নেহরু কন্যা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সুযোগে সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বা রাজ্যস্তরের বহু কার্যকর্তাকে বন্দি করে কারান্তরালে থাকতে বাধ্য করেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালে দলের সঙ্গে নির্বাচনে নিজেও

হেরে গেলে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়। ইন্দিরা গান্ধী নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন—''সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আমার জীবনে বিরাট ভুল।'' কংগ্রেসের আর এস এস বিরোধিতা বরাবর ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু কোনও যুক্তি আগেও ছিল না, এখনও নেই।

গান্ধী হত্যার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন—মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকসভার কার্যবিবরণীতে এই তথ্য পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্ণৌতে তাঁর এক প্রদত্ত ভাষণে আর এস এস-এর ভূয়সী প্রশংসাও করেন। (The Hindu, 07.01.48)

সঙ্ঘ প্রণেতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। দৈনন্দিন শাখা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সেচ্ছাসেবী সংগঠন। সঙ্ঘ হচ্ছে মানুষ তৈরির সংগঠন এবং শাখা হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। সঙ্ঘ প্রণেতা ডাক্তারজীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, দৈনন্দিন এক ঘণ্টার শাখার মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিকভাবে সংস্কারিত একশ্রেণীর চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক এবং জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে উদারনৈতিক মানুষ নির্মাণ করা। বিগত ৯৪ বছর ধরে সঙ্ঘ ডাক্তারজীর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশবাসী ইদানীং তার সুফলও ভোগ করছেন।

বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে এদের সিংহভাগই সঙ্ঘ অনুপ্রেরণার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্ঘের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমস্ত সংগঠনের শক্তিই বলে দেবে গত ৯৪ বছরে সর্বভারতীয়স্তরে আর এস এস কতটা শক্তি অর্জন করেছে। যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাভারতী, ছাত্রনীতিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিবেকানন্দ আদর্শের প্রচারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, গিরিবাসী-বনবাসীদের মধ্যে কর্মরত বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, দেশজুড়ে নরনারায়ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত কয়েক লক্ষ সেবা প্রকল্পের পরিচালক সেবাভারতী, রাজত্রৈনতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সংগঠনগুলিই যে বর্তমান ভারতে সবচেয়ে প্রভাবশালী একথা সঙ্ঘের ঘোর বিরোধীরাও অস্বীকার করবেন না। এছাড়া সংস্কৃত ভারতী, সংস্কার ভারতী, অধিবক্তা পরিষদ, আরোগ্য ভারতী, ক্রীড়া ভারতী ইত্যাদি রয়েছে।

১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলায় সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজী উপস্থিত হন এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর গান্ধীজী এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্ঘের এই অনুশাসন গান্ধীজীকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে এর প্রায় ১৩ বছরই পরেও (১৬.০৯.৪৭ তারিখ অর্থাৎ দেশভাগের ১ মাস পরে) দিল্লির ভাঙ্গি কলোনিতে স্বয়ংসেবকদের প্রশংসা করে বলেন—'I visited RSS camp years ago, when the founder Sri Headgewar was alive. I was very much impressed by your discipline. The complete obsence of untouchability and rigorous simplicity. Since then the sangh has grown. I am convinced that any organisation which is inspired by high ideal of service and self sacrifice, is founded to grow in strength. (The Hindu : 17.09.47).''

এছাড়াও লোকমান্য জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিচারপতি কে. টি. থমাস, বিজ্ঞানী জি. মাধবন নায়ার, বিজ্ঞানী কে. রাধাকৃষ্ণনের মতো ব্যক্তিরা নানা সময়ে আর এস এসের বিভিন্ন শিবির ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধে সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স অর্থাৎ প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় সারি হিসাবে ভারতীয় সেনাদের সহায়তায় যেভাবে আর এস এস এগিয়ে এসেছিল তার স্বীকৃতি হিসাবে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজে আর এস এসকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেবার মাত্র তিন দিনের নোটিশে তিন হাজার গণবেশধারী স্বয়ংসেবকের একটি সুসজ্জিত বাহিনী কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিল।

আবার ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দিল্লি পুলিশের উপর নিরাপত্তাজনিত কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দিল্লি শহরের যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাতে অর্পণ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯৪০ সালের ৯ জুন জীবনের অন্তিম ভাষণে বলেছিলেন—''হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সব হিন্দুকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। সঙ্ঘের আসল কাজ হবে শাখার বাইরে, সঙ্ঘ কেবল স্বয়ংসেবকদের জন্য নয়। সঙ্ঘের বাইরে যেসব হিন্দু আছে তাদের সবাইকে জোটবদ্ধ করারই হবে সঙ্ঘের আসল কাজ। হিন্দুদের প্রকৃত কল্যাণ সঙ্ঘের মাধ্যমেই হবে। হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজ আগামীদিনে আরও জোরের সঙ্গে করে যাবে সঙ্ঘ। এই কাজের মধ্যে দিয়েই একদিন হিন্দু ধর্মের সুসময় আসবে। তখন হিন্দু সমাজের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর সাহস আর কেউ করবে না।''

যে অরাজনৈতিক সংগঠন ১৯২৫ সাল থেকে এপর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়রূপে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই আর এস এস-এর গরিমা উপলব্ধি করা ভারত বিভাজনকারী, হিন্দুর সর্বনাশকারী, পাকিস্তানপ্রেমী এবং একবগ্গা মুসলিম তোষণকারী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সারা বিশ্ব বিস্ময়ে দেখছে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আবার বিশ্বসভায় যোগ্যস্থান লাভ করতে চলেছে। ■

উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ—ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং বাস্তবক্ষেত্র

জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী

দেশভাগের পরবর্তী ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কার সাধনের কোনও পদক্ষেপ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু সংবিধানের ১২৪ তম সংশোধনের মধ্য দিয়ে আর্থিকভাবে অনগ্রসর উচ্চবর্ণের জন্য ১০% সংরক্ষণ নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক বিপ্লব বলা যেতে পারে।

সামাজিক বিপ্লব বলা হলো কারণটা অনুসন্ধানের জন্য সংরক্ষণের ইতিহাসটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সংরক্ষণের জন্ম হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর অর্থাৎ স্বদেশি আন্দোলন যখন ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী হওয়া উৎপন্ন করে অতঃপর আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার জন্য ইংরেজদের Divide and Rule-এর অংশ হিসেবে ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংরক্ষণকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যেটার পরিণাম হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল পাশ করে যেটি Morley-Minto Act 1909 হিসেবে পরিচিত। বিলটিতে মুসলমানদের জন্য আলাদাভাবে আসন সংরক্ষণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বিলটিকে সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং ইংরেজ ষড়যন্ত্রে নিজেদেরকে শামিল করে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Ramsay Mcdonalnd communal Award ঘোষণা করে। আরও একবার ভারতীয় সমাজকে ভাগ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই বিলটিকে নিয়ে আসা হয়। এই বিলটিতে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিকে যুক্ত করে ভারতীয় হিন্দু সমাজের ভিতরে ভাঙ্গন ধরানোর বৃহৎ অপচেষ্টা করা যায়।

দেশভাগের সময় সংবিধান প্রণেতা ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধানে অনগ্রসর জাতি এবং উপজাতিদের শুধুমাত্র পরবর্তী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং তিনি এও বলেছিলেন যে যদি প্রয়োজন পড়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংশোধন করাও আবশ্যক।

কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক দল এটাকে সংশোধন করা তো দূরের কথা সংরক্ষণকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ স্বার্থসিদ্ধির খেলায় মেতেছিল। পরিণাম হিসেবে আবির্ভাব হয়েছিল মায়াবতী সহ একগুচ্ছ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকার জন্য জাতীয় স্তরের দল কংগ্রেসও সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। সমাজের একটা বড় অংশকে মূল সমাজের থেকে আলাদা করতে শুরু করে এবং ইংরেজদের সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতিকে বাস্তবায়ন পরোক্ষভাবে করতে থাকে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দেশবিরোধী কিছু শক্তি। কারণ জানে ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য এর থেকে বড় অস্ত্র হতে পারে না।

ব্রাহ্মণ্যবাদ নাম দিয়ে মার্কসবাদী কিছু সংগঠন ভারতের মূল সমাজকে ভাগ করার অপচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের ইতিহাস তার সাক্ষী। জাপানে বুরুকুমিন নামে একটা জাতির বাস আছে। যারা সামাজিকভাবে জাপানের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। এই বুরুকুমিন সমাজকে ব্যবহার করে জাপানের কিছু মার্কসবাদী সংগঠন জাপান রাষ্ট্রের ভিতরে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির জন্ম দেয়। কিন্তু জাপানের বুরুকুমিন সমাজ বা মূল সমাজ কমিউনিস্টদের এই অপচেষ্টাকে সার্থক হতে দেয়নি।

কমিউনিস্টরা একইরকম কাজ ভারতবর্ষেও করে যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের নাম দিয়ে সমাজকে বিভাজনের মাধ্যমে। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে যখনই সমাজের বিভাজন ঘটেছে তখনই রাষ্ট্রেরও বিভাজন হয়েছে। কমিউনিস্ট বা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকা কিছু স্বার্থলোভী দেশদ্রোহী শক্তির অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুরো ভারতীয় সমাজকে একজোট করে সংহতি ও ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। উচ্চবর্ণের মধ্য আর্থিকভাবে অনগ্রসর ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে ১০% সংরক্ষণ জাতীয় সংহতি ও ঐক্যর একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। ■

কাশ্মীরে আলাদা প্রধানমন্ত্রী চান ওমর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক ন্যাশনমাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার পাশাপাশি উত্তর স্বাধীনতাকালীন পৃথক কাশ্মীরের দাবি চাগিয়ে তুললেন। তিনি কাশ্মীরের জন্য একজন সদর ই-রিয়াসত (প্রেসিডেন্ট) ও একজন উজির-এ-আজম (প্রধানমন্ত্রী) যারা ভারতের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে উপত্যকার শাসন পরিচালনা করবেন এমন দাবি জানিয়েছেন। এ ধরনের চরম ভারতবিরোধী নাড়া দেওয়া মাত্রই প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অর্থমন্ত্রী জেটলি এর তীব্র বিরোধীতা করেছেন। আবদুল্লাকে তীব্র ধিক্কার জানানোর সঙ্গে মোদী কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি এই দাবিকে সমর্থন করে কিনা তা খোলসা করতে বলেছেন। তেলেঙ্গানার এক জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন তবে কি স্বাধীনতার এতদিন পরে ভারতে দু'জন প্রধানমন্ত্রী তৈরি করা হবে?

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া, তেলুগুদেশম নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু ও প্রবীণ এন সি পি নেতা শরদ পাওয়ারদের কাছে এ বিষয়ে তিনি তাদের মতামত দ্রুত ব্যক্ত করার আবেদন জানান। মোদী নির্দিষ্ট করে এই নেতারা আবদুল্লার সঙ্গে সহমত কিনা সেই প্রশ্ন তোলেন। মমতাকে উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য যিনি সর্বদা উচ্চগ্রামে চিৎকার করতে অভ্যস্ত তিনি কি আবদুল্লার দিকে? কলকাতার যে সভায় মমতা ও ইউটার্নবাবু চন্দ্রবাবুর সঙ্গে ফারুক আবদুল্লা হাত মিলিয়েছিলেন সেই চন্দ্রবাবুর অবস্থান কী? চন্দ্রবাবু তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ফারুক আবদুল্লা সদ্য অক্সে চন্দ্রবাবু স্বপক্ষে প্রচার করেছেন সেই আলাদা কাশ্মীরের দাবিদার ফারুক-সঙ্গী নাইডুর কি ভোট চাইবার কোনো অধিকার আছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে পরিস্থিতির চাপে ভারত বিদ্বেষীদের লুকনো চেহারাটা ক্রমশ নম দাঁত বার করছে।

ওয়ানাডে রাহুলের জোটসঙ্গী জামাত এবং এসডিপিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সিপিএম-এর দলীয় মুখপত্র 'দেশাভিমানী'তে রাজ্যের পার্টি সম্পাদক কোদিয়ারী বালকৃষ্ণনন একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন কেরলের মুসলিম লিগ নির্বাচনে কট্টরপন্থী জামাতকে সঙ্গী করার পাশাপাশি মৌলবাদী মুসলিম সংগঠন এনডিএফ-এর রাজনৈতিক মুখ এসডিপিআই-এর সঙ্গেও জোট বেঁধেছে। বালকৃষ্ণনন জানান এই তিন দলই ওয়েনাডে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের জোটসঙ্গী। বালকৃষ্ণননের বয়ান অনুযায়ী এই দল ও সংগঠনগুলিই ওয়েনাদে কংগ্রেসের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। ফলে এই মৌলবাদী ভারতবিরোধী সংগঠনের মুখ হিসেবেই রাহুল ওয়েনাদে বামেদের সঙ্গে লড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে দলীয় মুখপত্র অনুযায়ী সিপিএমের ওপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে রাহুলও এমন দেশবিরোধী শক্তিদেরে যে কোনো মূল্যে হারানোর। এই কেন্দ্রে জয় হাসিল করতে সিপিএম যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত বলে তারা জানান। রাহুলের মনোনয়নের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালকৃষ্ণনন বলেন মুসলিম মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে খোলাখুলি হাত মিলিয়ে নির্বাচন জেতার এই কৌশল কংগ্রেসের চূড়ান্ত রাজনৈতিক দেউলেপনারই প্রমাণ।

গিলানির দিল্লির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রায় ৪ কোটি টাকা বকেয়া আয়কর ফাঁকি দেওয়ার দায়ে দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত এলাকায় কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ শা গিলানির

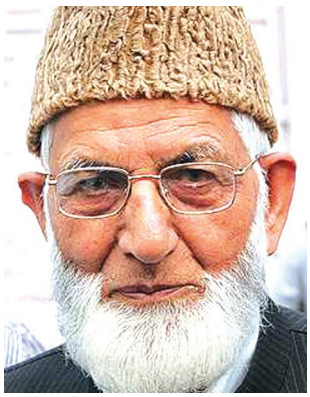

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল কেন্দ্রীয় আয়কর দপ্তর। সংবাদে প্রকাশ আয়কর দপ্তর সম্প্রতি পাকিস্তানপন্থী হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান সৈয়দ শা গিলানির বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে বড়ো ধরনের কর ফাঁকির হদিশ পায়। দীর্ঘদিন ধরে এই সন্ত্রাসপন্থী নেতা সরকারকে ফাঁকি দিয়ে আসছিলেন। এবারের অভিযানে তাঁর দক্ষিণে দিল্লিতে অবস্থিত অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টের সন্ধান পেয়ে দপ্তর কর্তৃপক্ষ আর দেরি করেননি। তালা পড়ে গেছে গিলানির ডেরায়। প্রসঙ্গত চলতি বছরের ২৯ মার্চ জারি করা এক নোটিশে আয়কর অধিকর্তারা জানান ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৩.৬ কোটি টাকা বকেয়া কর গিলানি দেননি। ২০১৫ সাল থেকেই আয়করের ধারা অনুযায়ী এই কর অনাদায়ী রয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে ২৯ মার্চের নোটিশে যে তারিখের মধ্যে বকেয়া কর মেটানো ধার্য্য হয়েছে তার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতবিরোধী হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা যদি ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বাজারে বিক্রি করে বকেয়া উদ্ধারের আইন মোতাবেক উদ্যোগ নেবে আয়কর দপ্তর। ভারতে বসেই ভারত সরকারকে ঠকানোর ঘুঘুরা একে একে ফাঁদে পড়ছে এমনটাই দেখা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির ভারত-বলিভিয়া বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সম্প্রতি বিদেশের সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে বলিভিয়ায় পৌঁছলে, সে দেশের রাষ্ট্রপতি ইভো মরলেস আয়মা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। ভারত ও বলিভিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটাই প্রথম কোনো ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বলিভিয়া সফর।

তাঁর এই সফরে শ্রী কোবিন্দ বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। পাশাপাশি, রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি পর্যায়েও বৈঠক করেন। ভারত-বলিভিয়া ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। ভারত ও বলিভিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য গত দু' বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-তে দাঁড়িয়েছিল ৮৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে বলিভিয়া ভারতের অষ্টম বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্ধু।

রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ, ভারত থেকে ওষুধ রপ্তানির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি জানান, ভারতে সস্তায় উন্নতমানের ওষুধ পাওয়া সম্ভব। প্রয়োজনে ভারতে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতিতে বলিভিয়াকে সাহায্য করতে পারে। গান্ধীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বলিভিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর দুটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রাষ্ট্রপতি।

ভারত ও বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সংস্কৃতি, মহাকাশ, উৎকৃষ্টমানের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা গঠন-সহ আটটি বিষয়ে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। আন্তর্জাতিক সৌর জোটে অংশগ্রহণের জন্য বলিভিয়া একটি চুক্তিও করে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী কোবিন্দকে সে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান কনডোর দি লস অ্যান্ডেস এন এল গ্র্যাডো দি গ্রান কলার প্রদান করা হয়।

পরে, রাষ্ট্রপতি গ্র্যাবিয়েল রেনে মরিনো

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত একটি প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেন। ভাষণে, রাষ্ট্রপতি একুশ শতকেও গান্ধীজীর আদর্শের তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া এক্সপ্রেস ভোটদাতাদের সচেতন করে তোলার বার্তা দেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দূরপাল্লার চারটি ট্রেনের যাত্রীদের ভোটদানের জন্য সচেতন করে তুলতে নির্বাচন কমিশন এবং ভারতীয় রেল যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-আমেদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি-সহ আরও তিনটি ট্রেনে এই প্রচার চালানো হবে।

হাওড়া এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ পর্যন্ত ছ'টি রাজ্যের ওপর দিয়ে প্রায় ২,০৮৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। আমেদাবাদ পৌঁছতে সময় নেয় প্রায় ৩৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ এই ট্রেনটিতে সফর করেন। দূরত্ব এবং যাত্রার সময় সহ ১৭টি স্টেশনে যাত্রা বিরতির বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই ভোটদাতাদের সচেতন করে তোলার বার্তা পৌঁছে দিতে এই ট্রেনটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সফরকারী ব্যক্তিরা ছাড়াও স্টেশনে যাত্রা বিরতির সময় সাধারণ মানুষও এই ট্রেনটির সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতে পারবেন।

অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও ভোটদাতাদের সচেতন করে তোলার জন্য কলকাতা মেট্রো রেলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের কাজ করছে।

মহাকাশে ভারতের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান (পিএসএলভি-সি ৪৫) আজ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সাফল্যের সঙ্গে 'এমিস্যাট' এবং আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের ২৮টি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে। এই প্রথম মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যানের সিরিজে একটি নতুন ও অত্যাধুনিক উৎক্ষেপণ যান ব্যবহার করা হয়েছে।

১ এপ্রিল সকাল ৯-২৭ মিনিটে মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে এই উপগ্রহগুলি উৎক্ষেপিত হয়। এর মাধ্যমে ভারতের 'এমিস্যাট' উপগ্রহকে ৭৪৮ কিলোমিটার উচ্চতায় সৌর-ভূসমলয় মেরু কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নজরদারি নেটওয়ার্ক এই উপগ্রহটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই এই উপগ্রহটিকে মহাকাশে তার নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করা হবে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ড. কে সিভান এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, ভারতের মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান ব্যবহার করে দেশের ৪৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি ক্ষুদ্র উপগ্রহ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা নির্মাণ করেছে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের ২৯৭টি উপগ্রহও এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এ বছরের মে মাসে পিএসএলভি-সি ৪৬ ব্যবহার করে 'রিস্যাট-২বি' উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মিলন কার্যকর হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, বিজয়া ব্যাঙ্ক এবং দেনা ব্যাঙ্ক সংযুক্ত হয়ে নতুন করে ব্যাঙ্ক অব বরোদা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটিই হবে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি সংযুক্ত এই ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করেছে। এই প্রথম ভারতে তিনটি ব্যাঙ্ককে যুক্ত করে একটি সংহত ব্যাঙ্কিং সংস্থা গড়ে তোলা হলো। সম্মিলিত ব্যাঙ্কগুলির মোট ৯, ৫০০০টিরও বেশি শাখা, ১৩,৪০০টিরও বেশি এটিএম এবং ৮৫ হাজারেরও বেশি কর্মী দেশের ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্রাহকদের সেবায় নিযুক্ত হবে।

সম্মিলিত এই ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এর শাখাগুলির ব্যাপক পরিধি এবং বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার সুবিধা পাবেন। সম্মিলিত এই ব্যাঙ্কের নাম হবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। এই উপলক্ষে ব্যাঙ্ক অব বরোদার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি এস জয়াকুমার সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন এবং জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, একটি আধুনিক ও বিশ্বমানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এই মিলনের ফলে গড়ে উঠবে এবং গ্রাহক, কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে কাজ করে যাবে।

নির্বাচনী পিটিশন, ফৌজদারি এবং দলত্যাগ বিরোধী মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার আহ্বান উপ-রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বিভিন্ন আদালতে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা নির্বাচনী পিটিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ওপর জোর দিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। জমে থাকা মামলার সমাধানের জন্য আগামী ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যে আলাদা বেঞ্চ গঠনেরও প্রস্তাব দেন তিনি। দল ত্যাগ বিরোধী বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আইনসভার আধিকারিকদের বিষয়টি দেখার আবেদন জানান উপ-রাষ্ট্রপতি।

বিশাখাপত্তনমে জেলা আদালাতের বার অ্যাসোসিয়েশনের ১২৫তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের ভাষণ দেন শ্রী নাইডু। অনুষ্ঠানে, বিশিষ্ট আইনজীবী, বিচারক এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে এক আলাপচারিতার সময় উপ-রাষ্ট্রপতি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র থাকাকালীন বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, আয়কর সংক্রান্ত মামলার জটিলতার কারণে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আটকে রয়েছে যা দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত। দেশের বিভিন্ন আদালতে ৩.১২ কোটি মামলা এখনও জমে রয়েছে যা যথেষ্টই উদ্বেগজনক। এই মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আদালত এবং বার অ্যাসোসিয়েশনকে গুরুত্ব সহকারে দেখার আহ্বান জানান শ্রী নাইডু। উপ-রাষ্ট্রপতি জানান, আইনজীবীরা সংবিধানের রক্ষাকর্তা। তাই, তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও মূলবোধের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন। মামলার সুবিধার্থে আদালতে যাতে স্থানীয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়, বার অ্যাসোসিয়েশনকে সে বিষয়টিও দেখার আবেদন জানান শ্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু।

দেশের প্রতিটি আইন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন বলে জানান উপ-রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানে, অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি এ ভি সেশা সাই, জেলা জজ তথা প্রধান পৃষ্ঠপোষক বি এস ভানুমতি, বিশাখাপত্তনম জেলা আদালত তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এম কে সীতারামাইয়া, সভাপতি বন্দারু রামকৃষ্ণ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডের স্বয়ংসেবক অনির্বাণ মুখার্জির শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে গত ১৯ মার্চ তাঁর বাবা সিদ্ধেশ্বর মুখার্জি ও মা শ্রীমতী সোমা মুখার্জি মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ড সেবা প্রমুখ নিমাই ঘোষ গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর পুত্র অত্রি-র অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েকের হাতে।

* * *

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের হাতে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার স্বয়ংসেবক অভিরূপ মিশ্রের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা পরেশনাথ মিশ্র শালতোড়া খণ্ড কার্যবাহ নিমাই কুম্ভকারের হাতে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডের আমডাঙ্গার স্বয়ংসেবক শ্যামল গারাই তাঁর কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের হাতে।

* * *

বাঁকুড়া জেলা শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ তথা বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক সৌরভ সিংহের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা বীরেন্দ্রনাথ সিংহ জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১০ মার্চ হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের স্বয়ংসেবক তথা ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর পুত্র দীপাঞ্জন ঘোষের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন প্রান্ত পরিযোজনা প্রমুখ সুশীল কুমার দলুইয়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধানিধি

গত ৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের স্বয়ংসেবক তরুণ কোটালের পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁরা চার ভাই এবং মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েকের হাতে। শ্রাদ্ধবাসরে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার দীর্ঘদিনের স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক ও লেখক অবসর প্রাপ্ত আয়কর বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুহাস কুমার বসু গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলা প্রচারক তন্ময় প্রমাণিকের পিতৃদেব অজিত কুমার প্রামাণিক গত ৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের বীরনগর শাখার স্বয়ংসেবক ধ্রুবনারায়ণ দাস গত ২০ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বীরনগর শাখার একেবারে প্রথম দিকের স্বয়ংসেবক ছিলেন। শাখা কার্যবাহ, খণ্ড কার্যবাহের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। পরে পরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হন, ২ দফায় বৈষ্ণবনগর ব্লকের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

* * *

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত পরিবার প্রবোধন প্রমুখ তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক মটুকেশ্বর পালের তৃতীয় বৌদি শ্রীমতী চন্দনা পাল তীর্থযাত্রার পথে বৃন্দাবনে গত ২৩ মার্চ এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটায় প্রাণ হারান। ২৫ মার্চ তাঁর মরদেহ মুর্শিদাবাদ জেলার বাছড়ায় আনা হয় এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি স্বামী, ২ কন্যা, ১ পুত্র সহ পরিবারের অনেককে রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক আনন্দ কুণ্ডু, গোপাল কুণ্ডু ও ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের সহ সভাপতি ডাঃ জয়দেব কুণ্ডুর মাতৃদেবী সীতা কুণ্ডু গত ২১ মার্চ দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা এবং নতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

শিলিগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক শান্তিলাল শেঠিয়া গত ২৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি রাজস্থানের স্বয়ংসেবক ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার নিগন শাখার স্বয়ংসেবক ভীম ঘোষ গত ২৮ মার্চ পরলোকগমন করেন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

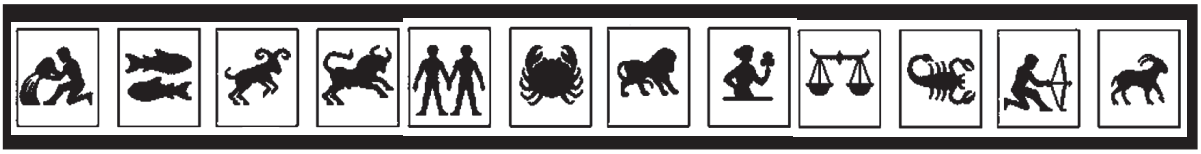

৮ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ১৪ এপ্রিল (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু, কুম্ভে বুধ, শুক্র। মীনে রবি। বৃহস্পতিবার বৃহস্পতি বক্রীরূপ লাভ করছে এবং শুক্রবার ভোর ৩-২৮ মিনিটে বুধের মীনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী নক্ষত্র থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ স্বজন বাৎসল্য ও আত্মীয় সখ্য বৃদ্ধি পেলেও প্রতিবেশীর ক্ষেত্র শুভ নহে। চিকিৎসাধীনের সঠিক রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে বহু পরিশ্রমের দ্বারা সাফল্য। সন্তানের আচার- আচরণে পরিবর্তন উদ্বেগের। বিদ্যার্থী ও ব্যবসায়ীর ফলপ্রসূ উদ্যোগ ও সাফল্য। গুরুজনের শারীরিক উন্নতি ও স্বস্তি। অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যয়ের সম্ভাবনা।

বৃষ ঃ বাস্তব বুদ্ধি, দৃঢ়প্রত্যয়, মানব বেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতিতে উচ্চশিক্ষা-প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও গবেষণায় প্রতিভার বহুমুখী প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা। বিলাসিতা, ভোজনপ্রিয়তা, শৌখিনতা, গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তিতে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। কাব্য-শাস্ত্রজ্ঞ, নাট্যকর্মী, শিল্পরসিক, সাহিত্যিকের সৃষ্টির নবদিগন্ত ও সামাজিক স্বীকৃতি।

মিথুন ঃ বিষয় বিবাদ ও আর্থিক টানাপোড়েনে স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হবে। স্বাধীন পেশায় নিযুক্তদের কাজ-অর্থ ও প্রসার বৃদ্ধি। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, প্যাথলজিস্ট, নির্মাণ শিল্প, ওষুধ ব্যবসায়ীর বিনিয়োগে সাফল্য ও উপার্জনের নতুন দিশা। সপ্তাহের শেষভাগে নিজ যোগ্যতায় হতাশার অবসানে প্রগতির পথে জীবনসঙ্গীর সহযোগিতা, ভাগ্যোন্নতি।

কর্কট ঃ জীবনসঙ্গীর হঠকারিতায় মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। কারিগরি কুশলতা ও সৃজনশীল কর্মে সাফল্য ও বহু যোগাযোগ ও অপ্রত্যাশিত কোনো খবরে বিশেষ আনন্দ। কোমল হৃদয়বৃত্তি, পরোপকার ও দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূরণ। জ্ঞাতি বিরোধ, বেকারদের নতুন কর্মসংস্থান।

সিংহ ঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি। নতুন কর্মের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব। কোনো বড়ো কাজের জন্য ঋণ হতে পারে। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ব ও সাহায্য। বিদ্যার্থী ও সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষায় অনায়াস সাফল্য। সপ্তাহের শেষভাগে নিকট বন্ধুর পরামর্শে কর্ম পরিকল্পনায় ব্যর্থতা।

কন্যা ঃ ব্যবসায়িক চিন্তায় অনুকূল সপ্তাহ। কর্মস্থলে সহকর্মীর সঙ্গে মনোমালিন্য। সুযোগসন্ধানীদের বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। হঠাৎ অসুস্থতা ও ক্লেশ ভোগ। আলপটকা মন্তব্য ও প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আর্থিক সুস্থিতি ও সন্তানের চঞ্চলতায় উদ্বেগ। গৃহশান্তি ও স্বজন বাৎসল্যে মানসিক প্রশান্তি।

তুলা ঃ জীবনসঙ্গীর দুর্বাক্যে পারিবারিক শান্তি ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। জাতক-জাতিকার নিজ পছন্দের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক ও গবেষকের প্রতিভার স্ফুরণ ও সম্মাননা। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ ও দূরদেশে গমন। ব্যবসায় বিনিয়োগ স্থগিত রাখুন। মামলা-মোকদ্দমার ফল ইতিবাচক।

বৃশ্চিক ঃ মন-মেজাজ শান্ত ও সংযত রেখে বুদ্ধিমত্তায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন। গৃহে আত্মীয় সমাগম, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনায় আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতায় জটিল সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের শংসা লাভ। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনার বাস্তবায়নও নৈসর্গিক দৃশ্য পরিদর্শন। অবৈধ প্রেমজ যোগাযোগে সম্মান ও অর্থ হানি।

ধনু ঃ স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। শারীরিক কারণে কর্মপরিকল্পনা স্থগিত ও আয়ের শ্লথ গতি। প্রতিবেশী ও ছলনাময়ীর কুহকে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। চর্ম, নির্মাণশিল্প, খনিজদ্রব্য, ধাতু ব্যবসায়ীর নব প্রচেষ্টায় সিদ্ধি করায়ত্ত। বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনে অধ্যাবসায় ও মনঃসংযোগ দরকার। চর্ম, চক্ষু ও দন্তপীড়ায় ক্লেশ।

মকর ঃ কাজের চাপে ক্লান্তি, অবসাদ ও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক পরিবেশের দিকে নজর দিন এব বিতর্কিত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। বহুদিনের বকেয়া পাওনার প্রাপ্তি ও হারানো দ্রব্যের পুনরুদ্ধার। প্রিয়জনের শুভ সংবাদ ও বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য লাভ, মানসিক প্রশান্তি। দূরদেশ যাত্রায় বাধা। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও সরীসৃপ থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

কুম্ভ ঃ পারিবারিক সুস্থিতি বজায় ও সুষ্ঠুভাবে কাজের সমাধা ও অর্থনীতি স্ফীতি লাভ করবে। পুরাতন গাড়ি-বাড়ি বিক্রয় ও পুরাতন মিত্রদের সঙ্গলাভ। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসা শুভ। বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনে মনোযোগ দরকার। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি, হঠাৎ আঘাত প্রাপ্তি বিষয়ে সতর্কথাকা দরকার।

মীন ঃ ভোগ্যপণ্য, খনিজ লৌহ, গাড়ি ও ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসায়ী ও খেলোয়াড়দের প্রসার ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। পুরানো কোনো দুশ্চিন্তা প্রকট হয়ে পারিবারিক সুস্থিতি বিনষ্ট ও উদ্বেগ। সহোদরের নতুন কর্মলাভ, সরকারি ও গুণীজনের সহযোগিতায় চলার গতির প্রসার। আর্থিক শুভ, কল্যাণমূলক কর্মে ভালো সুহৃদের দ্বারা মঙ্গললাভ, জনপ্রিয়তা ও মানসিক প্রশান্তি।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য